

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্যতাসমূহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাসরিন আক্তার

রোলঃ 23090121736

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য্যতাসমূহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাসরিন আক্তার

রোলঃ 23090121736

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য্যতাসমূহ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাসরিন আক্তার, আইডিঃ ----- বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

মাও: শারায়াত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

এরাবিক ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য্যতাসমূহ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

নাসরিন আক্তার

আইডিঃ 23090121736

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:.....	5
আকীদা ও বিশ্বাসে ইসলামের সৌন্দর্য:.....	9
❖ তাওহিদ:.....	9
❖ ফেরেশতা:.....	12
❖ আসমানী কিতাব:.....	12
❖ পয়গম্বর বা নবী:	14
❖ আখিরাত বা পরকাল:	15
❖ ত্বকদীর:.....	17
নারীর অধিকার বাস্তবায়নে ইসলামের সৌন্দর্য:	18
আম অধিকার বাস্তবায়নে ইসলামের সৌন্দর্য :.....	31
অপরাধীদের প্রতি দণ্ডবিধি প্রয়োগে ইসলামের বৈশিষ্ট্য:.....	32
যাকাত প্রদানে ইসলামের সৌন্দর্য :.....	43
পোশাক নির্বাচনে ইসলামের সৌন্দর্য:.....	52
মৃত ব্যক্তির শেষ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম:.....	56
উপসংহার:	63

ভূমিকা:

মহান আল্লাহ তায়া'লার অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে ইনসান আশরাফুল মাখলুকাত। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তাই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বহাল রাখতে আল্লাহ তায়া'লা মানুষের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য প্রতিনিধিকে(নবী) শিক্ষকস্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরকে প্রসিদ্ধ ১০৪ খানা আসমানী কিতাব দান করেছেন। তিনি মানবজাতিকে জাহ্নাম থেকে অবতারিত করে পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করেন।

সেসময় আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ (৩৯) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (৩৮) يَحْزَنُونَ

অর্থাৎ “আমি বললাম, ‘তোমরা সবাই তা থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না’। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।” [২: ৩৮-৩৯]

অতঃপর যে হিদায়াত তথা পথনির্দেশনা তিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পাঠিয়েছেন তা হলো আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম। আর সর্বপ্রথম মানুষ হযরত আদম (আ:)। আর যে যুগে যে ধর্ম দিয়ে আল্লাহ নবী প্রেরণ করেছেন সে যুগের জন্য সে ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম অবলম্বন করাই পথভ্রষ্টতা।

‘ইসলাম’ শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ। যার ধাতু ‘সিলম’ অর্থ শান্তি। প্রকৃত প্রস্তাবে বিরোধিতা ও সংঘাতে শান্তি নেই, শান্তি আছে আত্মসমর্পণে। যারা আত্মসমর্পণ করবে না, তাদের কোন ভয় থাকবে না, থাকবে না কোন আতঙ্ক, তারা পাবে নিরাপত্তা। তারা দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। তারা চিরসুখী হবে। তাদেরকে বলা হয় ‘মুসলিমুন’।

ইসলাম হলো সর্বাঙ্গসুন্দর দীন। এটাই হলো প্রকৃত ধর্ম। আল্লাহ তায়া'লা বলেন :

{ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ }

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম। [৩:১৯]

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থাৎ, আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [৩:৮৫]

ইসলাম হলো রাজপথ, প্রধান সড়ক। প্রধান সৃষ্টিকর্তার দিকে যাওয়ার একমাত্র পথ। পৃথিবীর অশান্তি আর পরকালীন শান্তি থেকে মুক্তির একমাত্র রাস্তা। বাকি যে সকল রাস্তা বিভিন্ন নাম দিয়ে ডানে-বামে বের হয়ে গেছে সেগুলো সব ই বক্র পথ, ভ্রষ্টতার পথ। দুনিয়া ও আখেরাতের ধ্বংসের পথ। পৃথিবীতে অশান্তি আর জাহান্নামের পথ। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থাৎ, আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।[৬: ১৫৩]

এছাড়াও নাওয়াস ইবনে সামআন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা সিরাতে মুস্তাকিমের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এর দু'দিকে দু'টি প্রাচীর রয়েছে এবং তাতে খোলা দরজা রয়েছে। দরজাগুলোর উপর পর্দা লটকান। রয়েছে। সোজা রাস্তাটির দরজার উপর আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী একটি লোক বসে আছে এবং বলছেঃ “হে লোক সকল! তোমরা সবাই এই সরল সোজা পথে চলে এসো। এদিক ওদিক যেয়ো না।” আর একটি নাক রাস্তার উপর থেকে ডাক দিতে রয়েছে। যখনই কোন লোক ঐ দরজাগুলোর কোন একটি দরজা খোলার ইচ্ছা করছে তখনই সে তাকে বলছে- “সর্বনাশ! ওটা খোলো না। কারণ যদি তুমি দরজাটি খুলে দাও তবে তুমি ওর মধ্যে প্রবেশই করে যাবে।”

এখন এই সরল সোজা পথটি হচ্ছে ইসলাম। আর প্রাচীরগুলো হচ্ছে আল্লাহর হুদূদ। এই খোলা দরজাগুলো হচ্ছে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ। রাস্তার মাথায় যে বসে আছে ওটা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর রাস্তার উপর থেকে যে ডাক দিচ্ছে সে হচ্ছে আল্লাহর উপদেশদাতা যা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে রয়েছে। অন্তর যেন তাকে খারাপ কাজ থেকে বাধা দিচ্ছে। (এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), তিরমীযী (রঃ) এবং নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন)

ইসলামই সেই পথ, যে পথ প্রত্যেক মুসলিম তার নামাযের প্রত্যেক রাকাতাতে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করে। সে বলে :

সূচনা (১:৬)

(৯) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (৬) أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

অর্থাৎ, আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। তাদের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছো। তাদের পথ নয়, যারা পথভ্রষ্ট(খ্রিস্টান) ও অভিশপ্ত(ইয়াহুদী)।

ইসলামই হলো মানব প্রকৃতির অনুকূল ধর্ম। মানব জীবনের সকল দিককে পরিবেষ্টন করে ইসলামের সুব্যবস্থা ও শুশ্রূষা। শুধু মানবই নয়, অমানবের মঙ্গলেও রয়েছে ইসলামের শাস্বত বিধান। যদিও এ বিশ্ব চরাচরের সবকিছুই মানব এর জন্যই সৃষ্টি, তবুও জীব- জন্তু ও উদ্ভিদের জন্য রয়েছে ইসলামে রয়েছে নানা বিধান।

ইসলামেই আছে জীবনের সুব্যবস্থা, শয়ন-শয্যা থেকে রাজ সিংহাসন পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান, সকল সংকটের মুক্তিপথ। ইহকাল ও পরকালের মোক্ষ লাভের সহজ উপায়। আর আল্লাহ তায়া'লা বলেন :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

অর্থাৎ, আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।

ইসলামের আছে আকর্ষণীয় রূপ শোভা, মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য, স্নিগ্ধকর সৌরভ। জ্ঞানীগণ সেই সৌন্দর্য ও সৌরভের সন্ধান পেয়ে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হন। অবশ্য সেই সৌন্দর্য ও সৌরভ প্রত্যেক মুসলিমের মধ্যে বিচ্ছুরিত নাও থাকতে পারে। প্রত্যেক ধারক ও বাহক, ধারন ও বহনে কর্তব্যপারায়ণ নাও হতে পারে। সে কথাও বুঝেন জ্ঞানীগণ।

যে জ্ঞানীর মনে সত্যের অনুসন্ধিৎসা থাকে, সে জ্ঞানী ইসলামের মাঝে সত্যের অনুসন্ধান পায়।

ইসলামের ত্রুটি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত অনেক পর্যবেক্ষক ইসলামের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামকে সাদরে গ্রহণ করেছেন।

ইসলামের পরিচিতি:

ইসলাম নামকরণ কেন⇒

দুনিয়ায় যত রকম ধর্ম রয়েছে তার প্রত্যেকটির নামকরণ হয়েছে কোন বিশেষ ব্যক্তির নামে। অথবা যে জাতির মধ্যে তার জন্ম হয়েছে তার নামে। যেমন, ঈসায়ী ধর্মের নাম রাখা হয়েছে তার প্রচারক হযরত ঈসা (আ)- এর নামে। বৌদ্ধ ধর্ম মতের নাম রাখা হয়েছে তার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা বুদ্ধের নামে। জরদশতি ধর্মের নামও হয়েছে তেমনি তার প্রতিষ্ঠাতা জরদশতের নামে। আবার ইয়াহুদী ধর্ম জন্ম নিয়েছিল ইয়াহুদা নামে বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্য। দুনিয়ায় আরো যেসব ধর্ম রয়েছে, তাদের নামকরণ হয়েছে এমনভাবে। অবশ্য নামের দিক দিয়ে ইসলামের রয়েছে একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা জাতির সাথে তার নামের

সংযোগ নেই। বরং ‘ইসলাম’ শব্দটির অর্থের মধ্যের আমরা একটি বিশেষ গুণের পরিচয় পাই, সেই গুণই প্রকাশ পাচ্ছে এ নামে। নাম থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলাম কোন এক ব্যক্তির আবিষ্কার নয়, কোন এক জাতির মধ্যে এ ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম কোন বিশেষ ব্যক্তি, দেশ অথবা জাতির সম্পত্তি নয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে ইসলামের গুণরাজি সৃষ্টি করা। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক কওমের যেসব খাঁটি ও সৎলোকের মধ্যে এসব গুণ পাওয়া গেছে, তারা ছিলেন ‘মুসলিম’। এ ধরনের লোক আজো রয়েছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন।

ইসলাম শব্দটির অর্থ

আরবী ভাষায় ‘ইসলাম’ বলতে বুঝায় আনুগত্য ও বাধ্যতা। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তার বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়া এ ধর্মের লক্ষ্য বলেই এর নাম হয়েছে ‘ইসলাম’।

আক্বীদা ও বিশ্বাসে ইসলামের সৌন্দর্য:

ইসলামের আক্বীদা বা ঈমানই ইসলামকে অন্যান্য ধর্ম থেকে পৃথক করে অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের সৌন্দর্যতা কে তুলে ধরে। আক্বীদার অন্যতম বিশ্বাসগুলি হলো তওহীদ, ফেরেশতা, কিতাব, নবী-রাসূল, আখিরাত, ত্বকদীর -এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

✦ তাওহীদ:

তাওহীদ (আরবি: توحيد) ইসলাম ধর্মে এক ঈশ্বরের ধারণাকে বোঝায়। তাওহীদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। ইসলামী পরিভাষায় তাওহীদ হল সৃষ্টি ও পরিচালনায় আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করা, সকল ইবাদাত-উপাসনা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য করা, অন্য সবকিছুর উপাসনা ত্যাগ করা, আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলীকে তার জন্য সাব্যস্ত করা এবং দোষ ত্রুটি থেকে আল্লাহকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করা।

কুরআনে বলা হয়েছে,

"..কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।"[কুরআন 42:11]

কুরআনের অন্যস্থানে বলা হয়েছে,

"বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই।"[কুরআন 112]

এই পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে অবস্থিত ইমানের দিক থেকে একেবারে দুর্বলতম কোনো মুসলমান ব্যক্তিও তার সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে মুখে স্বীকার করে ও অন্তরে বিশ্বাস করে। আর এই বিশ্বাস একজন মুসলিম কে অন্যান্য ধর্মের মানুষের চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করে। এই বিশ্বাস ই মুমিন-মুসলিম কে ক্ষমার অযোগ্য পাপ শিরক তথা আল্লাহর সাথে অংশীদার করা থেকে বিরত রাখে।

আর স্রষ্টাকে না দেখে বিশ্বাস করাকে ইসলামে পরিক্ষাসরূপ। কেননা পরিক্ষার হলে পরিক্ষার্থীর সামনে পরিক্ষক উপস্থিত থাকলে যেকোনো পরিক্ষার্থী সচেতন থেকেই পরিক্ষা দেয়, এটা পৃথিবীর যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক পরিক্ষার উদাহরণস্বরূপ।

আর ইসলাম ধর্মের অনুসারী তথা একজন মুমিনের জন্য দুনিয়া পরিক্ষাসরূপ। আল্লাহর জ্ঞান ও দৃষ্টি সর্বত্র বিরাজমান। এ জগতে আল্লাহ তিনি দৃশ্যমান নন। আল্লাহকে জান্নাতে দেখা যাবে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহর কর্ম ও গুণাবলি

সম্পর্কে আয়াত বর্ণিত হয়েছে, যার মাধ্যমে তার ব্যাপারে একজন জ্ঞানী মানুষ উজ্জ্বল ধারণা পেতে পারে। এছাড়াও এই দুনিয়াতে আল্লাহর নিয়ামত সরূপ অসংখ্য সৃষ্টি কে পর্যবেক্ষণ করলেই একজন জ্ঞানী আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। আল্লাহ তায়া'লা বলেন
: The Exile (59:22)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (۲۲) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۖ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (۲۳) هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) ۲۴

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী, পরম দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র, পূর্ণ শাস্তিময়, নিরাপত্তা দানকারী, প্রতাপশালী, পর্যবেক্ষক, মহা পরাক্রমশালী, অপ্রতিরোধ্য, প্রকৃত গর্বের অধিকারী। তারা যাকে (তাঁর) শরীক করে তাথেকে তিনি পবিত্র, মহান।

মুসলিম ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তাকে না দেখেই বিশ্বাস করে এবং ভয় করে, সেই ভয় থেকেই সৃষ্টিকর্তার দেওয়া আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে। ফলে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম সর্বদাই আল্লাহভীরু জীবন যাপন করে। এবং দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহর জ্ঞান ও দৃষ্টি সর্বত্র বিরাজমান। আল্লাহকে জানাতে দেখা যাবে। তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবনকারী, আকার আকৃতি প্রদানকারী। সমস্ত উত্তম নামের অধিকারী। আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তাঁর গৌরব ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত মহা প্রজ্ঞাবান। [৫৯:২২-২৪]

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَحْيِي وَيُمِيتُ (۱) سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ (۲) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۳) وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بُولِجٌ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ (۴) لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (۵) بَصِيرٌ (۶) فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

[আল-হাদিদ ৫৭:১-৬]

অর্থাৎ, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আসমানসমূহ ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই;

তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান; আর তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনিই প্রথম ও শেষ; প্রকাশ্য (উপরে) ও গোপন (নিকটে) আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি ‘আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উখিত হয় [১]। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন--তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। আসমানসমূহ ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই এবং আল্লাহরই দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনে আর দিনকে প্রবেশ করান রাতে এবং তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। ৫৭:১-৬]

⊗ অপরদিকে অন্যান্য ধর্মে সৃষ্টিকর্তার সাথে শরীক তথা অন্য কাউকে অংশীদার করা হয়। যেমন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা ত্রিত্ববাদ তত্ত্ব বিশ্বাস করে। যা শিরক। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ তায়া’লা বলেন :

(৩) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (২) اللَّهُ الصَّمَدُ (১) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

অর্থাৎ, বলুন , ‘তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ হচ্ছেন ‘সামাদ’, (তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।’

⊗ এছাড়াও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তাদের সৃষ্টিকর্তার বিভিন্ন রূপের প্রতিমা তৈরি করে সেই প্রতিমার নিকটে নিজেদের প্রয়োজন, ইচ্ছে আর সকল প্রার্থনা করার নামে শিরকে লিপ্ত রয়েছে।

অতএব ইসলামি আক্বীদা ও বিশ্বাসে অন্যান্য ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব যেকোনো জ্ঞানী জন সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবে।

তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে অবিশ্বাসের কারণেই বর্তমানে সংশয়বাদীদের সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

✦ ফেরেশতা:

ফিরিশতা বা ফেরেশতা(আরবি: ١٤٤١)(ইংরেজি: Angels) ইসলামী বিশ্বাসমতে স্বর্গীয় দূত। আরবিতে ফেরেশতাদের একবচনে মালাইকা ও বহুবচনে মালাক বলে। বলা হয় এদেরকে আল্লাহ নূর বা আলো দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতার সর্বদা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তারা আল্লাহর অবাধ্য হয় না। তারা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে না। ফেরেশতাগণ আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। যেমন : বৃষ্টিবর্ষণ, প্রাণীর জান কবজ, মানবজাতির ছোট-বড়, ভাল-মন্দ যাবতীয় কর্মের হিসাব সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

✦ আসমানী কিতাব:

আসমানী কিতাব বা ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলতে এমন কতকগুলো গ্রন্থকে বোঝানো হয়, ইসলাম ধর্মমতে মুসলমানগণ যে গ্রন্থগুলোকে ঈশ্বরপ্রদত্ত গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করেন।

মুসলিম বিশ্বাস মতে, আসমানি কিতাবের সংখ্যা ১০৪ খানা। যা বিভিন্ন সময় আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী বা সংবাদ বাহকের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করা হয়।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘জেনে রাখো যে, আল্লাহর জ্ঞান অনুসারেই তা (কুরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) হবে কী?’ (সূরা হূদ- ১১/১৪)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, ‘পরম করুণাময়, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করার ভাষা।’ (সূরা আর রহমান- ৫৫/১-৪)

আনাস ইবনু মালিক রাঃ বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম (নর-নারীর) উপর ফরজ। (ইবনে মাজাহ্, হাঃ ২২৪, মিশকাত, হাঃ ২১৮)

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদের শিক্ষাদেন কিতাব (কুরআন) ও হিকমাহ (সুন্নাহ)।’ (সূরা জুমুআহ-৬২/২)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব (কুরআন) ও হিকমাহ (সুন্নাহ) শিক্ষা দেয় আর তোমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না। (সূরা বাকারা-২/১৫১)

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া বিদ্যমান ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র ইসলাম ধর্মের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে প্রায় ১৪০০ বছরের ও বেশি সময় যাবত অপরিবর্তিত রয়েছে। এখন পর্যন্ত এতে একটি অক্ষরও সংযোজন কিংবা সংশোধন করা হয়নি। পৃথিবীর সকল প্রান্তের প্রত্যেকটি কুরআন ই অভিন্ন। পৃথিবীর বুকে ইসলামই একমাত্র এমন ধর্ম, যার অনুসারীগণ স্রষ্টার উপাসনা ও দাসত্ব করে সরাসরি তারই নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসারে। সরাসরি তারই গাইড-বুক থেকে গ্রহণ করে নিজেদের জীবন সংবিধান। যা প্রলয় দিবসের পূর্ব পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। যেহেতু সৃষ্টিকর্তা নিজেই এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং সেই অনুসারে তার অনুগতগণ সেই চেষ্টায় ব্রতী রয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরা অবশ্যই তার সংরক্ষক। [সূরা হিজর:৯] وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ (৪৭) بِأَيِّنَّا إِلَّا الْكَافِرُونَ (৪৮) بَلْ هُوَ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِأَيِّنَّا إِلَّا الظَّالِمُونَ (৪৯) অর্থাৎ, আর এভাবেই আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি অতঃপর যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছিলাম তারা এর উপর ঈমান রাখে। আর এদেরও কেউ কেউ এতে ঈমান রাখে। আর কাফিররা ছাড়া কেউই আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে না। আর আপনি তো এর আগে কোনো কিতাব পড়েননি এবং নিজ হাতে কোনো কিতাবও লেখেননি যে, বাতিলপন্থীরা সন্দেহ পোষণ করবে। বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে বস্তুত তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন। আর শুধু যালিমরাই আমাদের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে।

[সূরা আনকাবুত: ৪৭-৪৯]

এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই একমাত্র গ্রন্থ যে গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য মুসলিমের অন্তরে হুবুহু মুখস্থ ভাবে ধারণকৃত রয়েছে। ইসলাম সকল আসমানী কিতাব(ঐশীগ্রন্থ) এর প্রতি ইমান ও বিশ্বাস রাখাকে ওয়াজিব মনে করে। অর্থাৎ মুসলিম রা কোন আসমানী কিতাব অস্বীকার করে না। ইতোপূর্বে তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ইত্যাদি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস রাখে। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেন :

আল-বাকারাহ ২:১৩৬

قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

অর্থাৎ, তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।

❖ পয়গম্বর বা নবী:

ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতির জন্য একজন বা একাধিক মানুষকে নবী বা রাসূল (বার্তাবাহক) পাঠিয়েছেন। তারা মানুষকে সৎ ও ন্যায়ের দিকে আহ্বান করেন এবং মানুষকে তার কর্মফলের ভিত্তিতে পরকালে পুরস্কারের সুসংবাদ দেন ও শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেন।

শুধুমাত্র শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছেন। সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন :

“আমি তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।”

(আল কোরআন - ২:২৫৬)

নবী রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে।

০ মানুষকে কুরআনের আয়াত পাঠ করে শোনানো।

০ উম্মতকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা। অর্থাৎ কুফর, শিরক ও জুলুম পবিত্র করা।

০ কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেওয়া। এখানে কিতাব বলতে পবিত্র কুরআন এবং হিকমাহ বলতে রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত উক্তিগত ও কর্মগত শিক্ষাসমূহ বুঝানো হয়েছে।

সকল নবী-রাসূলগণ নিঃসন্দেহে নিষ্পাপ, পূণ্যবান। কোনো একজন নবীর ব্যাপারে এটা অবিশ্বাস করলে মুসলিমের ইমান ভঙ্গ হয়ে যাবে।

অথচ হিন্দুধর্মের একাধিক অবতারের চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে তাদের প্রত্যেকেরই জানা রয়েছে।

✦ আখিরাত বা পরকাল:

মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে আখিরাত তথা পরকালের প্রতি বিশ্বাস। আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাসই মানুষকে সৎকর্মে অনুপ্রেরণা জোগায় এবং যাবতীয় মন্দ কর্ম হতে নিভৃত রাখে। আখিরাতে বিশ্বাস মানে হলো মৃত্যুর পর পুনরায় অনন্ত জীবন লাভ করা। এই জীবনের সকল কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও যথাযথ ভালো বা মন্দ ফল প্রাপ্তি এবং পরিণাম হিসেবে জান্নাত ও জাহান্নাম ভোগ করা। বিশ্বাসীদের পঞ্চ বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হলো আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস।

মানবজীবন পরিক্রমা চারটি জগতে পরিব্যাপ্ত। যথা: আলমে আরওয়াহ, আলমে দুনিয়া, আলমে বারজাখ ও আলমে আখিরাত। মানুষ হলো রুহ, নফস ও দেহের সম্মিলিত রূপ। আলমে আরওয়াহ বা রুহের জগতে শুধু রুহ ছিল, সঙ্গে ছিল নফস। এটি মানবজীবন চক্রের প্রথম জগৎ। আলমে দুনিয়া বা দুনিয়ার জগতে রুহ ও নফসের সঙ্গে দেহ বা শরীর যোগ হয়েছে, মৃত্যুর মাধ্যমে এই জগতের পরিসমাপ্তি হবে। এটি মানবজীবন চক্রের দ্বিতীয় জগৎ।

মৃত্যুর মাধ্যমে রুহ ও নফস দেহ ছেড়ে আলমে বারজাখে পাড়ি দেয়। এটি হলো ব্যক্তির কিয়ামত বা ব্যক্তির জাগতিক জীবনের পরিসমাপ্তি।

হাদিস শরিফে রয়েছে, ‘যখন কারও মৃত্যু হয়, তখন তার কিয়ামত সংঘটিত হয়।’ আলমে বারজাখ বা বারজাখ জগতে (মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত তথা হাশর-নশরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে) রুহ ও নফস ইল্লিন বা ছিজ্জিনে অবস্থান করবে এবং দেহ হয়তো বিলীন হয়ে যাবে, নয়তো সুরক্ষিত থাকবে। দ্বিতীয় কিয়ামত তথা শিঙায় প্রথম ফুৎকারে বড় কিয়ামত তথা সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রলয় বা ধ্বংস সংঘটিত হবে।

কোরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এ জগতে যা কিছু আছে সবই লয়প্রাপ্ত হবে, শুধু আপনার রবের অস্তিত্বই টিকে থাকবে।’ (সূরা-৫৫ আর রহমান, আয়াত: ২৬-২৭)। মৃত্যু বা প্রথম কিয়ামতের পর থেকে এবং দ্বিতীয় কিয়ামত বা শিঙায় প্রথম ফুৎকারের পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত আলমে বারজাখ বা বারজাখ জীবন। এটি মানবজীবন চক্রের তৃতীয় জগৎ। তৃতীয় কিয়ামত, অর্থাৎ শিঙায় দ্বিতীয় ফুৎকারের পর হাশর ও নশর তথা পুনরুত্থান ও মহামিলন বা মহাসম্মিলন অনুষ্ঠিত হবে। এটিই চূড়ান্ত কিয়ামত। এই দিনই বিচারের দিন এবং আখিরাত বা পরকালের অনন্ত জীবনের সূচনা এদিন থেকেই হবে, যে জীবনের আর কোনো শেষ নেই, নেই কোনো সীমা। এটি মানবজীবন চক্রের চতুর্থ বা শেষ জগৎ। এই জগতের কোনো পরিসমাপ্তি নেই।

আখের অর্থ শেষ বা চূড়ান্ত। আখিরাত মানে পরকাল বা ভবিষ্যৎকাল ও অনাগতকাল। আখিরাত বা পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাস মানবজীবনাচার সুসংযত ও সুসংহত করে।

কারণ, এর সঙ্গে বিচার ও কর্মফল জড়িত। জান্নাত-জাহান্নাম এরই সঙ্গে সম্পর্কিত। বলতে গেলে পরকালে বিশ্বাসই ইমানের তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। হাদিস শরিফে রয়েছে, ‘ইমান আশা ও ভয়ের মধ্যে অবস্থান করে।’ আর আশা ও ভয় হলো পরকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়।

আশা মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে, ভয় মানুষকে অন্যায় কর্ম থেকে বিরত রাখে। আশা না থাকলে ইহকালীন ও পরকালীন কোনো উন্নতিই সম্ভবপর নয়; ভয় না থাকলে সংযম ও সংযত আচরণ অসম্ভব প্রায়। আখিরাত সম্পর্কে কোরআনে বহু আয়াত রয়েছে। যেমন:

“আর অবশ্যই আপনার জন্য প্রথম জগৎ দুনিয়া অপেক্ষা আখিরাতই উত্তম বা শ্রেয়। অচিরেই আপনার রব আপনাকে দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।” (সূরা-৯৩, ওয়াদ-দুহা, আয়াত: ৪-৫)।

মোমিন হলো দুনিয়াতে পরবাসী। আখিরাত বা পরকাল হলো মোমিন বা বিশ্বাসীদের আপন বাড়ি। আল্লাহ তাআলা আদি পিতা-মাতা হজরত আদম ও হজরত হাওয়াকে সৃষ্টি করে জান্নাতেই রেখেছিলেন। কুদরতের হেকমতে বা কৌশলগত কারণে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। আর বলে দিয়েছেন, তোমরা আমার হিদায়াত ও পথনির্দেশ অনুসরণ করলে আবার এখানেই ফিরে আসবে। আল্লাহ তাআলা মহানবী হজরত মুহাম্মাদকে মিরাজ রজনীতে এই জান্নাত দেখিয়ে এনেছেন, যাতে তিনি উম্মতকে এ বিষয়ে জানাতে পারেন। জান্নাত বা পরকালের আটটি বাড়ি হচ্ছে জান্নাতুল ফিরদাউস, জান্নাতুল মাওয়া, জান্নাতুল আদন, দারুণ নাজিম, দারুস সালাম, দারুল কারার, দারুল মাকাম বা দারুল মুকাম, দুনিয়ায় মানুষ হলো প্রবাসী বা পরবাসী। প্রবাসকালীন জীবনে প্রবাসী সব সময় আপন বাড়ির স্মরণ করে। এই স্মরণই তাকে উপার্জনে ও সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে; কষ্টসহিষ্ণু, সংযমী ও আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। এভাবেই প্রবাসজীবন শেষে একটি স্থিতিশীল, সুখী, সমৃদ্ধিশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনে সক্ষমতা লাভ করে।

পরকালীন নিবাস সম্পর্কে কোরআন কারিমে বহু আয়াত রয়েছে। যেমন:

“হে রাসুল (সা.), আপনি বলুন! হে আমার জাতি, তোমরা তোমাদের অবস্থান থেকে সামর্থ্যমতো সৎকর্ম করো, আমিও করছি; অচিরেই তোমরা জানতে পারবে পরিণতির শুভ নিবাস কাদের জন্য।” (সূরা-৬ আনআম, আয়াত: ১৩৫)।

“তোমাদের প্রতি শান্তি! যেহেতু তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ, পরিণতি জান্নাতের বাড়ি কত না উত্তম।” (সূরা-১৩ রাআদ, আয়াত: ২৪)। “যারা সৎকর্ম করবে, তারা দুনিয়াতেও কল্যাণ লাভ করবে, পরকালের নিবাস অতি উত্তম; মুত্তাকিদের নিবাস কত না উত্তম।” (সূরা-১৬ নাহল, আয়াত: ৩০)। “নিশ্চয়ই পরকালের নিবাস চিরস্থায়ী, যদি তারা জানত।” (সূরা-২৯ আনকাবুত, আয়াত: ৬৪)। “নিশ্চয়ই আখিরাত হলো স্থিতিশীল স্থায়ী নিবাস।” (সূরা-৪০ মোমিন, আয়াত: ৩৯)।

❖ ত্বকদীর:

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের সর্বশেষ তাকদীর তথা ভালো-মন্দ নির্ধারণে বিশ্বাস। তাকদীরের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, এই বিশ্বাস করতে হবে যে, সবকিছুকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, সেগুলি সৃষ্টি হওয়ার আগেই তিনি সে সম্পর্কে জানেন, তিনি তা লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন এবং সবকিছু তার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে,

"তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তা জানেন? নিশ্চয় তা একটি কিতাবে রয়েছে। অবশ্যই এটা আল্লাহর জন্য অতি সহজ।"

—কুরআন ২২:৭০

"আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন।"

—কুরআন ৮১:২৯

হাদীসে বলা হয়েছে,

"...যদি সমগ্র উম্মত তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (তাকদীরে) লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (তাকদীরে) লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (তাকদীরের লিপি) শুকিয়ে গেছে।"

—তিরমিযী ২৫১৬ (হাসান সহীহ)।

হাদিস শরীফে বর্ণিত রয়েছে, “দুনিয়া মুমিনের জেলখানা আর কাফিরের বেহেস্ত খানা ”

মুমিন-মুসলিম ব্যক্তি তার পরকালের চিরস্থায়ী শান্তির আবাস জান্নাতের কথা ভেবে দুনিয়া নামক জেলখানায় কয়েদির মতো একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবন পার করে দেয়। জেলখানায় কয়েদির ইচ্ছার যেমন কোন প্রাধান্যতা থাকে না তেমনি দুনিয়াতে মুমিনের ইচ্ছারও কোন প্রাধান্য থাকে না। ফলে সেই মুমিন ব্যক্তি নানা ধরনের কষ্ট আর পরিশ্রম মধ্যে দিয়েই জীবন অতিবাহিত করে। ফলস্বরূপ সে পরকালে সফলকাম হবে।

মুমিন ব্যক্তি আক্বীদার উল্লেখযোগ্য ৬টি বিষয়ের উপর ভয় ও আশা নিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে। সে অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করে।

অপরদিকে অন্যান্য ধর্মের এমনভাবে নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নেই। যার জন্য তারা নির্দিধায় বিভিন্ন পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পরে সহজে।

নারীর অধিকার বাস্তবায়নে ইসলামের সৌন্দর্য:

ইতিহাস সাক্ষী যে, দীর্ঘকাল ধরে নারীরা নির্যাতিত ছিল। গ্রীস, মিশর, ইরাক, ভারত, চীন, বাস্তবে, প্রতিটি জাতি ও অঞ্চলে এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে নারীদের উপর অত্যাচারের পাহাড় ভেঙে পড়েনি। মানুষ তাদের নিজস্ব আনন্দ ও বিলাসিতা অর্জনের জন্য তাদের কেনাবেচা করত এবং তাদের সাথে পশুর চেয়েও খারাপ আচরণ করা হত; এমনকি আরবরাও নারীর অস্তিত্বকে লজ্জার কারণ মনে করত এবং মেয়েদের জীবন্ত কবর দিত। ভারতে, বিধবাকে তার স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হত - অন্যান্য ধর্ম নারীদের পাপের উৎস এবং পাপের দরজা এবং পাপের মূর্ত প্রতীক বলে মনে করত। তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়াকে আধ্যাত্মিক অগ্রগতির বাধা হিসেবে বিবেচনা করা হত। বিশ্বের বেশিরভাগ সভ্যতায়, তার কোনও সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তাকে অবজ্ঞা করা হত এবং অপমানিত করা হত। তার কোনও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না, সে স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারত না। সে তার পিতার, তারপর তার স্বামীর এবং তারপর তার পুত্র সন্তানদের অধীনস্থ এবং পরাধীন ছিল। তার নিজস্ব কোনও ইচ্ছা ছিল না, এমনকি কারও উপর তার কোনও ক্ষমতাও ছিল না; তার কান্নাকাটির অধিকারও ছিল না।

নারীকে বাঁচিয়ে রাখার অধিকার:

আরবের নারীদের অবস্থা সারা বিশ্বে একই রকম ছিল; আরবের কিছু উপজাতি তাদের মেয়েদের কবর দিত।

পবিত্র কুরআন তাকে কঠোরভাবে হুমকি দিয়েছে এবং নারীকে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে এবং বলেছে যে, যে কেউ তার অধিকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে,

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল?(আত-তাকবীর ৮-৯)

সেই সময়ের কথা মনে করো যখন জীবন্ত কবর দেওয়া মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করা হবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

একদিকে, এই নিরপরাধদের প্রতি করা অন্যায় ও বাড়াবাড়ির জন্য জাহান্নামের হুমকি ঘোষণা করা হয়েছিল, অন্যদিকে, যারা এই অন্যায় থেকে মুক্ত ছিল এবং মেয়েদের সাথে ছেলেদের মতো আচরণ করত, তাদের জন্য জাহান্নামের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল এবং উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। তাই, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন: “যার কন্যা সন্তান আছে, সে যেন তাকে জীবন্ত কবর না দেয়, তাকে অবজ্ঞার চোখে না দেখে এবং তার চেয়ে তার পুত্রকে অগ্রাধিকার না দেয়, কারণ আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।” (আবু দাউদ, বাব ফদল মিন আল ইয়াতামী, আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আল-আশা’আত আল-সিজিস্তানি, মাকতাবা মা’আরিফ লল-নাশর ওয়াল-তাওয়িজ, পৃ. ৯৩০)

★মানুষ হিসেবে নারী:

ইসলাম নারীর প্রতি প্রথম যে অনুগ্রহ করেছিল তা হলো নারীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পুরুষ ও নারী উভয়ের চিন্তাভাবনা এবং মানসিকতার পরিবর্তন আনা। এটি পুরুষদের হৃদয় ও মনে নারীর মর্যাদা নির্ধারণ করেছিল। এটি তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার পূরণের দায়িত্ব পালন করেছিল।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু’জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী(আন-নিসা: ১)

আল্লাহ তোমাদেরকে একজন মানুষ আদম থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন।

অতএব, মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ এবং মহিলা সকলেই সমান। এখানে, পুরুষদের জন্য, একজন পুরুষের পুরুষত্ব গর্বের কিছু নয়, এবং তার নারীত্বও একজন নারীর জন্য লজ্জার কিছু নয়। এখানে, পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এবং মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি এবং গুণাবলীর দিক থেকে, প্রকৃতির এক মহান শিল্পকর্ম। যিনি, তার গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে, সমগ্র সৃষ্টির সেরাজীব। সবচেয়ে সম্মানিত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রশংসা করে বলেছে:

আর অবশ্যই আমি আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি, তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম জিনিসপত্র থেকে রিযিক দিয়েছি এবং তাদেরকে আমাদের অনেক সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, [স্পষ্ট] অগ্রাধিকার দিয়েছি। (সূরা বনি ইসরাঈল: (৭০)

আর সূরা আত-তীনে আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন:

আমি অবশ্যই মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। (সূরা আত-তীন: ৪)

অতএব, আদমকে অন্যান্য সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং মানুষ হিসেবে তাকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তাতে নারীরও সমান অংশ রয়েছে।

[ইসলামে নারীর মর্যাদা ও মর্যাদা সুরায়া বাতুল আলাভি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নতুন দিল্লি (১৯৯৩, পৃ. (৩১)]

নারীর শিক্ষার অধিকার:

মানুষের বিকাশ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। জ্ঞান ছাড়া, যে কোনও ব্যক্তি বা জাতি জীবনের সাধনায় পিছিয়ে পড়ে। এবং তাদের নিস্তেজ মনের কারণে, তারা জীবনের পর্যায়ে খুব বেশি এগিয়ে চিন্তা করতে পারে না, এবং তারা বস্তুগত অগ্রগতির কোনও সম্ভাবনাও দেখতে পায় না; কিন্তু তা সত্ত্বেও, ইতিহাসের একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে যেখানে নারীদের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং এর প্রয়োজনীয়তা কেবল পুরুষদের জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল। এবং তাদের মধ্যেও, শুধুমাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা জ্ঞান অর্জন করেছিল, এবং নারীরা জ্ঞান থেকে অনেক দূরে অজ্ঞতার জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত করেছিল।

কিন্তু ইসলাম জ্ঞানকে বাধ্যতামূলক করেছে এবং পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই তার দরজা খুলে দিয়েছে এবং তার পথে সকল বাধা ও সীমাবদ্ধতা দূর করেছে। ইসলাম মেয়েদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে এবং এটিকে উৎসাহিত করেছে, যেমন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরজ।”

এবং অন্য জায়গায় আবু সাঈদ খুদরি রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান লালন-পালন করবে, তাদের শিক্ষিত করবে, তাদের বিয়ে দেবে এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, তার জন্য জান্নাত থাকবে। (আবু দাউদ, ...)

(অনাথ শিশুদের উচ্চ স্তরে, মারেফ প্রকাশনা ও বিতরণ অফিস, পৃ. ৯৩১)

যে ব্যক্তি তিনটি মেয়েকে লালন-পালন করে, তাদের শিক্ষিত করে, বিবাহ দেয় এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে (এমনকি পরেও), তার জন্য জান্নাত রয়েছে।

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্বোধন করে এবং সকলকে ইবাদত, নীতি ও শরীয়তের আবদ্ধ করে রেখেছে, যা জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। জ্ঞান ছাড়া একজন নারী তার অধিকার রক্ষা করতে পারে না, ইসলাম তার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালন করতে পারে না; তাই পুরুষের পাশাপাশি নারীদের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অতীতে ইসলামে পুরুষদের মধ্যে যেমন জ্ঞানের প্রসার ঘটেছে, তেমনি নারীদের মধ্যেও তা প্রসার লাভ করেছে। সাহাবীদের মধ্যেও প্রচুর সংখ্যক নারী রয়েছেন যাদের কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান রয়েছে। কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিষয়গুলি বের করা এবং ফতোয়া দেওয়া খুবই কঠিন এবং সূক্ষ্ম কাজ; তবুও, মহিলারা এই ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলেন না; বরং তারা সাহাবীদের (আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট) সমকক্ষ ছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের কথা উল্লেখ করা হল। উদাহরণস্বরূপ:

হযরত আয়েশা (রা.), হযরত উম্মে সালমা (রা.), হযরত উম্মে আতিয়া (রা.), হযরত সাফিয়া (রা.), হযরত উম্মে হাবিবা (রা.), আসমা বিনতে আবু বকর (রা.), উম্মে শারিক (রা.), ফাতিমা বিনতে কায়স (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট ছিলেন। (মুসলিম নারীর অধিকার এবং তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি পর্যালোচনা: সৈয়দ জালাল-উদ-দীন ওমারি, ইসলামিক গবেষণা ও লেখা বিভাগ, মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ২৯)

সামাজিক ক্ষেত্র:

অন্যান্য সমাজ যেমন নারীদের জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, বিপরীতে, ইসলামী সমাজ কিছু পরিস্থিতিতে পুরুষদের তুলনায় তাদের বেশি শ্রেষ্ঠত্ব এবং সম্মান দিয়েছে। বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে আগমনকারী নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই নির্যাতিত শ্রেণীর কাছে এই মূল্যবান হাদিসটি বর্ণনা করেছিলেন:

নারী ও সুগন্ধি আমার কাছে এই পৃথিবী থেকে প্রিয় করে তোলা হয়েছে, এবং আমার চোখের শীতলতা নামাজের মধ্যে রাখা হয়েছে। (নাসাঈ। আবু আবদুর রহমান ইবনে শুআইব ইবনে আলী, যিনি (আল-নাসাঈ) নামে পরিচিত, মা'আরিফ প্রকাশনা ও বিতরণ অফিস, ১৩০৩ হিজরি, পৃ. ৬০৯)

অর্থাৎ এই পৃথিবীর জিনিসপত্রের মধ্যে, আমি নারী, সুগন্ধি এবং আমার চোখকে ভালোবাসি। আমার চোখের শীতলতা নামাজের মধ্যে স্থাপন করা হয়।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীর প্রতি ঘৃণা ও লাঞ্ছনা তাকওয়ার প্রমাণ নয়। একজন ব্যক্তি তখনই আল্লাহর প্রিয় হতে পারে যখন সে আল্লাহর বান্দাদের উপর প্রদত্ত সমস্ত অনুগ্রহের প্রশংসা করে, তাঁর আদেশ ও সৌন্দর্য কামনা করে এবং নারীদের সাথে যথাযথ আচরণ করে। এই কারণেই পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য বিবাহ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেছেন:

বিবাহ আমার সুন্নত, আর যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার দলভুক্ত নয়। (বুখারী, বিবাহের বই, বুক হাউস)(রশিদী, দাবলি, পৃষ্ঠা ৭৫৭-৭৫৮)

অতএব, একজন নারী, একজন স্ত্রী হিসেবে, তার স্বামীর ঘরের রানী এবং পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক (সূরা বাকারা: ১৮৭)।

অর্থাৎ, তোমাদের দুজনের ব্যক্তিত্ব একে অপরের সাথে সম্পূর্ণ। যদি তোমরা তাদের জন্য সৌন্দর্য এবং অলংকরণের উৎস হও, তাহলে তারা তোমাদের জন্যও অলংকরণ এবং অলংকরণের উৎস। তোমাদের দুজনের জীবনের অনেক দিক আছে যা একে অপরকে ছাড়া পূর্ণ হতে পারে না। (ইসলামে নারীর অবস্থান এবং মর্যাদা, সুরায়া বাতুল আলাভি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নতুন)

★অর্থনৈতিক অধিকার:

সমাজে সম্মান অর্থনৈতিক মর্যাদার উপর নির্ভর করে। যাদের সম্পদ এবং ক্ষমতা আছে তাদের মানুষ সম্মানের চোখে দেখে, আর যাদের নেই তারা সম্মান তো দূরের কথা, পাশ কাটিয়ে যেতেও চায় না। বিশ্বের সকল সমাজ এবং ব্যবস্থা নারীদের অর্থনৈতিকভাবে খুবই দুর্বল করে রেখেছে, ইসলাম ছাড়া, এবং এই অর্থনৈতিক দুর্বলতা তাদের নিপীড়ন ও দারিদ্র্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতা নারীদের সাথে এইভাবে আচরণ করেছে। তারা নারীদের ঘর থেকে বের করে কারখানা এবং অন্যান্য স্থানে কাজ করতে বাধ্য

করেছিলেন। এইভাবে, ঘরের বাইরে যাওয়া নারীরা আরও অনেক মন্দ কাজের কারণ হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা সংযমের পথ গ্রহণ করেছে।

ইসলামে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির উদাহরণস্বরূপ:

(১) ভরণপোষণ :

একজন নারীর ভরণপোষণ সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের দায়িত্ব। যদি মেয়ে হয়, তাহলে তা পিতার দায়িত্ব।

দায়িত্ব: যদি বোন হয়, তাহলে ভাইয়ের দায়িত্ব; যদি স্ত্রী হয়, তাহলে স্বামীর দায়িত্ব তার ভরণপোষণ করা; এবং যদি মা হয়, তাহলে তার খরচ জোগানোর দায়িত্ব তার পুত্রের।

কেননা নারী সৃষ্টিগত ভাবেই দুর্বল, তাই পুরুষকেই তার কর্তা নির্বাচন করেছে।

মহান আল্লাহ বলেন:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِنَاتٌ ۙ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

অর্থাৎ পুরুষেরা নারীদের উপর কূর্তত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ

(সূরা নিসা ৪:৩৪)

(২) মোহর:

পুরুষের উপর নারীর মোহরানা প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন:

আর নারীদেরকে তাদের মোহরানা বিনামূল্যে দান করো, কিন্তু যদি তারা স্বেচ্ছায় তার কিছু অংশ তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়, তাহলে তা ভোগ করো।

নারীদের প্রাপ্য মোহরানা আনন্দের সাথে পরিশোধ করো। যদি তারা স্বেচ্ছায় তোমাদের কিছু মাফ করে দেয়, তাহলে আনন্দের সাথে তা খাও।

এছাড়াও আল্লাহ অনত্র বলেছেন:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সংকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব (সূরা বাকারা ২: ২৩৬)

(৩) উত্তরাধিকার:

কিছু ধর্ম অনুসারে, নারীদের উত্তরাধিকারের কোন অধিকার নেই; কিন্তু এই ধর্ম ও সমাজের বিপরীতে, ইসলাম নারীদের উত্তরাধিকারে নিয়মিত অংশ দিয়েছে। এর জন্য, কুরআনে বলা হয়েছে যে

পুরুষ নারীর দ্বিগুণ অংশ পাবে। (আন-নিসা: (১১) অর্থাৎ, একজন নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক, এবং সে তার পিতা, স্বামী, সন্তান এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে নিয়মিত উত্তরাধিকারের অধিকারী।

(৪) সম্পত্তির অধিকার: অতএব, একজন মহিলা মোহর এবং উত্তরাধিকার থেকে যে সম্পদই পান না কেন, তিনি তার পূর্ণ মালিক; কারণ তার কোনও আর্থিক দায়িত্ব নেই; বরং, তিনি সকলের কাছ থেকে তা পান; অতএব, এটি তার কাছে নিরাপদ। পুরুষ যদি চায়, তাহলে উত্তরাধিকারে তার দ্বিগুণ অংশ আছে; তবে তাকে তা যে কোনও ক্ষেত্রে মহিলার উপর ব্যয় করতে হবে।

অতএব, এইভাবে, ইসলামী সমাজে একজন মহিলার আর্থিক অবস্থা এতটাই স্থিতিশীল হয়ে ওঠে যে তিনি কখনও কখনও একজন পুরুষের চেয়ে ভালো অবস্থানে থাকেন।

(৫) তারপর সে তার সম্পদ যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারবে, এর উপর কারো কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, সে তা তার স্বামীকে বা তার সন্তানদের দিতে চায়, কাউকে দান করতে চায়, নাকি আল্লাহর পথে দান করতে চায়, এটা তার নিজস্ব ইচ্ছা এবং যদি সে নিজে তা উপার্জন করে, তাহলে সেও এর মালিক; কিন্তু তার স্বামী তাকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য, সে তা উপার্জন করুক বা না করুক। এভাবে, ইসলাম প্রদত্ত অর্থনৈতিক অধিকার নারীকে এতটাই শক্তিশালী করে তোলে যে, সে যতই তাকে ধন্যবাদ জানাক না কেন, তা কম; অপরদিকে অন্যান্য ধর্মের নারীরা এই অর্থনৈতিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

★আইনের সভ্যতা:

স্বামী নির্বাচন: ইসলাম নারীদের স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রচুর স্বাধীনতা দিয়েছে। বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের ইচ্ছা এবং অনুমতি সকল পরিস্থিতিতেই অপরিহার্য।

এটিকে আবশ্যিক ঘোষণা করা হয়েছে। নবী (সাঃ) বলেছেন: বিধবাকে তার সাথে পরামর্শ না করা পর্যন্ত বিয়ে দেওয়া উচিত নয়, এবং কুমারীকে তার অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত বিয়ে করা উচিত নয়। (মিশকাত, বিবাহের বই, বই)

খান নাজ্জী, দেওবন্দ, পৃ. (270)

বিবাহিত নারীর সাথে পরামর্শ না করে বিয়ে করা উচিত নয় এবং কুমারী নারীর সাথে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে করা উচিত নয় (মিশকুত, নারীদের অধ্যায় ১০, কিতাব খানা নাজ্জী, দেওবন্দ, পৃ. ২৮১)।

এছাড়াও যদি কারো শৈশবে বিয়ে হয়, এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর মেয়েটির ইচ্ছা এতে অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে তার বিবাহ প্রত্যাখ্যান করার বিকল্প আছে, এবং এই ক্ষেত্রে, কেউ তাকে জোর করতে পারে না।

হ্যাঁ, যদি কোনও মহিলা এমন কোনও পুরুষকে বিয়ে করতে চান যিনি অনৈতিক অথবা তার পরিবারের সাথে একমত নন, তাহলে এই ক্ষেত্রে, সাধুরা অবশ্যই হস্তক্ষেপ করবেন।

বিচ্ছেদের অধিকার:

ইসলাম একজন নারীকে তালাক দেওয়ার অধিকার দিয়েছে যদি তার স্বামী অবাঞ্ছিত, নিষ্ঠুর এবং অযোগ্য হয় এবং এই অধিকারগুলি আদালতের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়।

সুন্দর ব্যবহার পাওয়ার অধিকার :

কুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: “আর তোমরা নারীদের সাথে সদয় আচরণ করো” (আন-নিসা: ১৯)। এভাবেই, স্বামীকে তার স্ত্রীর সাথে সদয়তা ও উদারতার সাথে আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি এবং তাদের পরিবারের প্রতি সদয়।” (মিশকাত, কিতাবুল নিকাহ, না’ইমিয়া লাইব্রেরি, দেওবন্দ, পৃ. ২৭০)

★স্ত্রীদের অধিকার:

ইসলামের আবির্ভাবের পর মানুষ নারীদের অবজ্ঞার চোখে দেখত। এই পতনের একটি রূপ ছিল যে মানুষ ইবাদতে এতটাই মগ্ন ছিল যে তারা তাদের স্ত্রীদের পরোয়া করত না। হযরত আমর বিন আল আস এবং হযরত আবু দারদার ঘটনাটি হাদিসে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের স্ত্রীরা তাদের অতিরিক্ত ইবাদতের কারণে তাদের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ডেকে ব্যাখ্যা করে বললেন, “তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদেরও অধিকার আছে, তাই তোমাদের ইবাদতের পাশাপাশি তোমাদের স্ত্রীদেরও যত্ন নিও।”

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে কথা বলেছেন :

“ হে মানুষ! নারীদের ব্যাপারে আমার উপদেশ গ্রহণ করো, তারা তোমাদের রত্ন। তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার অনুসারে তাদেরকে তোমাদের ঘরে নিয়ে এসেছো এবং আল্লাহর আইন অনুসারে তাদের দেহ গ্রহণ করেছো। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হলো এমন কাউকে তোমাদের ঘরে ঢুকতে দিও না যার উপস্থিতি তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা তা করে, তাহলে তোমরা তাদের মারধরও করতে পারো এবং তাদের খাওয়ানো ও পান করানো তোমাদের উপর ফরজ।” (মিশকাত, সহীহ মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত, বিদায় হজ্জের কাহিনীতে, কিতাব খানা নঈমিয়াহ, দেওবন্দ, পৃ. (২২৫)

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অনত্র বলেছেন:

“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই যে তার স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম, আর আমি আমার স্ত্রীর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম” (মিশকাত, দশজন মহিলার অধ্যায়, নঈমিয়াহ কিতাব, দেওবন্দ)।
পৃ: (২৮১)

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে তার স্ত্রীদের কাছে এবং নিজের কাছেও উত্তম।
ঈমানের দিক থেকে তারাই সবচেয়ে পরিপূর্ণ যারা চরিত্রের দিক থেকে সর্বোত্তম এবং চিরকালই সবচেয়ে দয়ালু। (17)

অর্থাৎ সবচেয়ে পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি যার চরিত্র ভালো এবং তার পরিবারের প্রতি সদয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী প্রমাণ করে যে পুরুষদের তাদের স্ত্রীদের প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা ও স্নেহ থাকা উচিত এবং সকল বৈধ বিষয়ে তাদের উৎসাহিত করা এবং সাহায্য দেওয়া উচিত। কিছুক্ষণের জন্য অন্যদের সামনে ভালোভাবে উপস্থাপন করা কঠিন নয়। প্রকৃত সৎ ও ভালো ব্যক্তি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি তার স্ত্রীর সাথে সাহচর্যের সময় ধৈর্যশীল এবং সহনশীল এবং প্রেমময় ও স্নেহশীল। (ইসলামে নারীর অবস্থান, সুরায়া বাতুল আলাউয়ি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নেতি, দুবাই, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৬০-৬১)

ইসলামে নারীর সামাজিক অবস্থান:

ইসলামে নারীদের সামাজিক মর্যাদা এতটাই উচ্চ যে, মহান আল্লাহ তাআলা পুরুষদের বিশেষভাবে সম্বোধন করে তাদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় "সুপরিচিত" হিসেবে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তারা

সৌন্দর্য প্রতিটি দিক এবং সবকিছুতে সমাজকে বহন করে। ইরশাদ রব্বানী তিনি বলেন:

كَرِيْمُوْهُنَّ فِيْهِ حَيِّ

আর এইসব নারীদের সাথে ভালোভাবে বসবাস করো। যদি তুমি তাদের অপছন্দ করো, তাহলে সম্ভব যে তুমি কিছু অপছন্দ করো এবং আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখতে পারেন।

সমাজ মানে একসাথে বসবাস করা, এই অর্থে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে একদিকে পুরুষদের নারীদের সাথে একসাথে বসবাস করার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে, এটি সুপরিচিতদের সাথে যুক্ত, তাই ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস আল-রাযী (মৃত্যু ৭০ হিজরী)

সুপরিচিতদের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন যে এর মধ্যে নারীর ভরণপোষণ, যৌতুক এবং ন্যায়বিচার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

আর ভালো জীবনযাপনের অর্থ হলো, কথাবার্তায় অত্যন্ত সৌজন্য ও স্নেহের সাথে আচরণ করা, কথাবার্তায় মিষ্টি ও প্রেমময় হওয়া, দাপট দেখানো, কোনও বিষয় মনোযোগ সহকারে শোনা, উদাসীন বা উদাসীন না হওয়া এবং কোনও খারাপ রসবোধ প্রদর্শন করা উচিত নয়।

(ইসলামে নারীর অবস্থান, মৌলভী আব্দুল সামাদ রহমানী, ধর্মীয় শিক্ষা উর্দু বাজার, দিল্লি, পৃ. ১৭)

কুরআন কেবল সামাজিক কারণেই নারীদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করার জন্য পুরুষদের বাধ্যতামূলক করেনি, বরং সকল ধরনের বিষয়েও একই কথা বলেছে। উদাহরণস্বরূপ, তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের সম্পর্কে, এটি স্পষ্টভাবে বলেছে:

ক্ষতি বা সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে [তোমার সম্পদ] আটকে রেখো না। (আল-বাক্বারাহ: ২৩১)

তাদের ক্ষতি করার চিন্তা করে তাদের আটকে রেখো না, পাছে তোমরা সীমালঙ্ঘন করো।

★মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার:

ইসলামে, নারীদেরও পুরুষদের মতোই স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে, তা সে ধর্মীয় হোক বা পার্থিব, যাই হোক না কেন। ধর্মীয় সীমানার মধ্যে পুরুষদের মতোই স্বাধীনভাবে তার মতামত প্রয়োগের পূর্ণ অধিকার তাদের রয়েছে।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) বললেন: "তোমাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, নারীদের মোহরানা বৃদ্ধি করো না। যদি মোহরানা বৃদ্ধি আল্লাহর দৃষ্টিতে পার্থিব সম্মান এবং ধার্মিকতার বিষয় হত, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিক যোগ্য হতেন।" (তিরমিযী)

জনাকীর্ণ জনসমাবেশে হযরত উমর (রাঃ) এর এই ভাষণের সময় একজন মহিলা বাধা দিয়ে বললেন, "তুমি এটা কিভাবে বলতে পারো?" যখন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

আর যদি তুমি তাদের কাউকে প্রচুর পরিমাণে [ধন-সম্পদ] দান করে থাকো, তবে তা থেকে কিছুই [ফিরিয়ে নেবে না]। (আন-নিসা: ২০)

আর যদি তুমি তাদের একজনকে অনেক সম্পত্তি দিয়ে থাকো, তাহলে তা থেকে কিছুই নিও না। যখন আল্লাহ স্বামীর জন্য এক কুইন্টালও যৌতুক দেওয়া বৈধ করে দিয়েছেন, তাহলে তুমি কে তা নিষেধ করার? হযরত উমর (রাঃ) এই কথা শুনে বললেন: তোমরা সবাই উমরের চেয়ে বেশি জানো।

যারা তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। হযরত উমরকে বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং কেন তাকে আপত্তি জানানো হয়েছিল, তার কারণে এই মহিলার মতামতের স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয়নি; কারণ হযরত উমরের বক্তব্য অগ্রাধিকার এবং উৎকর্ষতার ছিল।

এটি প্রমাণ করে যে নারীদের নিজস্ব মতামত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে; এমনকি ইসলাম দাসীদেরও তাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশের অধিকার দিয়েছে।

★নারীর পোশাক: কামুকদের কামনা, লম্পটদের লম্পাট্য ও ইভটিজারদের ইভটিজিং থেকে নারীকে মুক্তি দিতে ইসলাম নারীকে পর্দার বিধান দিয়েছে। সম্ভ্রান্ত নারীদের পরিচয় দিতে ইসলামে নারীদের হিজাব ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

ইসলাম নারীদের ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষের চেয়ে অধিক সম্মান দিয়েছে। যেমন : হাদিসে বর্ণিত রয়েছে “ মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত। ” আল্লাহ তায়া'লা নির্দিষ্ট দূরত্বের কোন সফরে নারীকে তার জন্য নির্ধারিত মাহরাম পুরুষকে সঙ্গী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন,

নারীকে একাকী অবস্থায় দূরবর্তী সফরে যেতে নিষেধ করেছেন।

যেমন ভাবে একজন রাজার রানীকে সম্মান দিয়ে তার নিরাপত্তার সার্থে প্রহরী নির্ধারণ করে দেন।

কিন্তু বর্তমানে নারীদের “সমান অধিকার” এবং “নারী ক্ষমতায়ন ” এর নামে নারীদের কে বিভিন্ন কাজে পণ্যের মতো প্রদর্শনী হিসেবে বিশ্ব বাজারে তুলে ধরেছে। নারীদের কে কর্মক্ষেত্রে স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ঘর থেকে বের করে এনে একদল কুচক্রকারী তাদের ব্যবসায় লাভবান হচ্ছে। এতে করে নারীদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য লোপ পাচ্ছে আর তারই ফলশ্রুতিতে মেয়েরা এখন ঘরের বাহিরে বিভিন্ন ভাবে সম্মানহানির স্বীকার হচ্ছে, নারীদের সন্তান জন্মদান এবং সন্তান পালনে অনীহা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এছাড়াও অন্যান্য কতিপয় ধর্মে নারীদের উপর আয়-উপার্জনের দায়িত্বও রয়েছে, যেটা নারীদের ফিতরাত বহির্ভূত কাজ, যা নারীর জন্য খুবই কষ্টকর।

কেননা আয়-উপার্জন করে সংসার পরিবারের দায়িত্ব পরিচালনা করা কতোটা কঠিন এটা একজন পুরুষ মাত্রই সহজে অনুধাবন করতে পারবে।

এই দিক থেকেও ইসলামে নারীদের অন্যান্য ধর্মের উপর অধিক মর্যাদা দিয়েছে।

জ্ঞানীজন এই নারীর মর্যাদা তুলনামূলক আলোচনার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের সৌন্দর্য্যতা অনুধাবন করতে পারবে।

আম অধিকার বাস্তবায়নে ইসলামের সৌন্দর্য :

ইসলাম প্রতিটি মানুষকে তার অধিকার প্রধান করতে উদ্বুদ্ধ করে। শুধু মানুষই নয় জীব-জন্তুর কিংবা উদ্ভিদের অধিকার সম্বন্ধেও উদাসীন নয় ইসলাম। অধিকারীর অধিকার লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছে ইসলাম। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

অর্থাৎ অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না(সূরা বাক্বারাহ :১৯০, সূরা মায়িদাহ:৮৭)

পশুর প্রতি দয়া প্রদর্শনে পুরস্কার রেখেছে ইসলাম।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি রাস্তায় চলার পথে অত্যন্ত তৃষ্ণাগ্রস্ত হল। তারপর একটি কূয়া দেখতে পেয়ে তাতে সে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। উপরে উঠে এসে সে দেখতে পেল একটি কুকুর হ্যাঁপাচ্ছে আর পিপাসার দরুন ভিজে মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, এই কুকুরটির তেমনি পিপাসা পেয়েছে, যেমনি আমার পিপাসা পেয়েছিল। তারপর সে কূয়ার মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা পানি ভর্তি করে এনে কুকুরটিকে পান করাল। আল্লাহ তার এই কাজ কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। সাহাবীগণ বলল, হে আল্লাহর রসূল! পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের পুণ্য রয়েছে? তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, প্রাণী মাত্রের সেবার মধ্যেই পুণ্য আছে।

সহিহ বুখারী: ২৪৬৬

Source: <https://ihadis.com/bukhari/hadith/2466>

অপরাধীদের প্রতি দণ্ডবিধি প্রয়োগে ইসলামের বৈশিষ্ট্য:

১। অপরাধীর শাস্তি প্রয়োগ করবে শাসন কর্তৃপক্ষ। কোন ব্যক্তিবিশেষ কোন দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতে পারে না। চোরের হাত কাটা, মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য ব্যক্তিকে হত্যা করা ইত্যাদি কোন সাধারণ মানুষ করতে পারে না। রাষ্ট্রনেতা বা মুসলিম নেতা ছাড়া ব্যক্তি পর্যায়ে জিহাদ ঘোষণাও করতে পারে না।

মহানবী বলেছেন,

(إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ).

অর্থাৎ, ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক) তো ঢাল স্বরূপ; যার আড়ালে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং যার সাহায্যে নিজেকে বাঁচানো যায়। (বুখারী ২৯৫৭, মুসলিম ১৮৪১ নং)

২। পৃথিবীর বুকে অপরাধী গ্রেফতার হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হলে পরকালে আর সাজা ভোগ করতে হবে না অথবা পরকালের সাজা হালকা হয়ে যাবে।

৩। ইসলামের বিধানে বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের সাজা মৃত্যুদণ্ড। ইসলাম কাউকে ইসলাম গ্রহণে জোর-জবরদস্তি করে না। কিন্তু কেউ স্বেচ্ছায় সর্বশেষ ও সৃষ্টিকর্তার একমাত্র মনোনীত ধীন ইসলাম গ্রহণ করার পর তা ত্যাগ করলে তাকে বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মনে করে। আর তার দ্বারা ইসলামের বিশাল ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তাই তার শাস্তি এত কঠিন।

তাছাড়া তার পারলৌকিক শাস্তি তো আছেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَنْ يَزِدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (২১৭)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে এবং সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) রূপে মৃত্যুবরণ করে, তাদের ইহকাল ও পরকালের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। তারাই দোযখবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (বাক্বারাহঃ ২১৭)

এ হল মানুষের পঞ্চপ্রয়োজনীয় জিনিসের অন্যতম, ঈমান রক্ষার তাকীদ।

৪। ইসলাম নরহত্যাকে হারাম ঘোষণা করেছে। কেউ কাউকে হত্যা করলে এবং সরকারের হাতে ধরা না পড়লে পরকালে তার শাস্তি জাহান্নাম রেখেছে। ধরা পড়লে তার সাজার ব্যাপারে হত ব্যক্তির ওয়ারেসদেরকে এখতিয়ার দিয়েছে, তারা চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারে অথবা তার প্রাণদন্ড মাফ করে অর্থদন্ড গ্রহণ করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورة البقرة ১৭৮)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিস্বাসের (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান) বিধিবদ্ধ করা হল; স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত। এ তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তার লাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। (বাক্বারাহঃ ১৭৮)

তারা সম্মত না হলে সরকারের করার কিছু নেই। খুনের বদলে খুন করা হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (১৭৯)

অর্থাৎ, (হে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য কিস্বাসে (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধানে) জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। (বাক্বারাহঃ ১৭৯)

যখন হত্যাকারীর এই ভয় হবে যে, আমাকেও কিস্বাসে হত্যা করা হবে, তখন সে কাউকে হত্যা করতে সাহস পাবে না। যে সমাজে কিস্বাসের আইন বলবৎ থাকে, সে সমাজে এ (কিস্বাসে হত্যা হওয়ার) ভয় সমাজকে হত্যা ও খুনোখুনি থেকে সুরক্ষিত রাখে এবং এরই ফলে সমাজে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

তাছাড়া এ ব্যবস্থা না হলে হত ব্যক্তির ওয়ারেসরা নিজের হাতে বদলা নিতে গিয়ে একটার জায়গায় দুইটা বা তারও বেশি, অনুরূপ পাল্টা আক্রমণে তাদের মধ্যে আরও অনেকে খুন

হতে পারে। আর এইভাবে খুনের সিলসিলা চালু থাকলে মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই ইসলামের ঐ সুন্দর ব্যবস্থা।

আর এ হল মানুষের পঞ্চপ্রয়োজনীয় জিনিসের অন্যতম, প্রাণ রক্ষার তাকীদ।

৫। ইসলাম মানুষের জ্ঞানের কদর করে। ইসলামী ভাৱ অর্পিত হওয়ার একটি শর্তই হল জ্ঞান। জ্ঞানহীন বা জ্ঞানশূন্য মানুষের জন্য ইসলাম ফরয নয়। জ্ঞানবত্তাই মানুষ ও পশুর মাঝে পার্থক্য সূচিত করে। জ্ঞানবত্তাই মানবকে মানবতার উচ্চাসন দান করে। অতএব তার সুরক্ষা ও প্রতিপালনের প্রয়োজন আছে। সেই জ্ঞান উজ্জ্বল করার প্রয়োজন আছে, যে জ্ঞান দিয়ে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে নিতে পারে। সৎ ও সঠিক পথ বেছে নিতে পারে। সেই জ্ঞানের সুরক্ষার প্রয়োজন আছে, যা কোন প্রকার বাতিলের অনুপ্রবেশে অথবা অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার জীবাণু মিশ্রণে নষ্ট হতে পারে। অথবা কোন মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে বিলীন বা দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۹ۦ) (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ) (سورة المائدة ৯১)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? (মায়িদাহঃ ৯০-৯১)

আল্লাহর রসূল বলেন, "যে ব্যক্তি মদ পান করবে সে ব্যক্তির ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এরপর যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন। অন্যথা যদি সে পুনরায় পান করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। যদি এর পরেও সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নেবেন।

অন্যথা যদি সে তৃতীয়বার পান করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এর পরেও যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন। অন্যথা যদি সে চতুর্থবার তা পান করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এরপরে সে যদি তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন না, তিনি তার প্রতি ক্রোধাশ্বিত হন এবং (পরকালে) তাকে 'খাবাল নদী' থেকে পানীয় পান করাবেন।"

ইবনে উমার-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আবু আব্দুর রহমান!

'খাবাল-নদী' কী?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তা হল জাহান্নামবাসীদের পুঁজ দ্বারা প্রবাহিত (জাহান্নামের) এক নদী।' (তিরমিযী, হাকেম ৪/১৪৬, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৬৩ ১২-৬৩ ১৩নং)

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যাস থাকা অবস্থায় মারা যাবে সে ব্যক্তি মূর্তিপূজকের মত (পাপী) হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে।" (ত্বাবারানীর কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৭৭নং)

আর এ হল মানুষের পঞ্চপ্রয়োজনীয় জিনিসের অন্যতম, জ্ঞান রক্ষার তাকীদ।

৬। ইসলাম মনুষ্য-সমাজকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন দেখতে চায়। অশ্লীলতা ও চারিত্রিক নোংরামি থেকে মানুষকে শুদ্ধ করতে চায়। সুন্দর চরিত্র গঠনের মাঝে উন্নত সমাজ গড়তে চায়। নারী-পুরুষের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্ট সকল প্রকার নোংরামি থেকে সমাজকে পবিত্র রাখতে চায়। তাই ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা করে এবং উক্ত কুকর্মের ধারেপাশেও যেতে নিষেধ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্ট সকল প্রকার নোংরামি থেকে সমাজকে পবিত্র রাখতে চায়। তাই ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা করে এবং উক্ত কুকর্মের ধারেপাশেও যেতে নিষেধ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (سورة الإسراء ৩২)

অর্থাৎ, তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (বানী ইস্রাঈল: ৩২)

কিন্তু সে নিষেধ অমান্য করে যে ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, ইসলাম তাকে সাজা দেয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (২) (সূরা নূর)

অর্থাৎ, ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী---ওদের প্রত্যেককে একশো কশাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত না করে; যদি তোমরা আল্লাহতে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও। আর বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি

প্রত্যক্ষ করে। (নূর: ২)

এ হল অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষের সাজা। পক্ষান্তরে বিবাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষের সাজা হল কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর ছুড়ে হত্যা।

এক বেদুঈন পরিবারে এক অবিবাহিত যুবক কর্মচারী নিযুক্ত ছিল।

বাড়ির বধূর সাথে তার প্রকৃতিগত আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। সংযমের বাঁধ ভাঙলে এক সময় তাদের মাঝে ব্যভিচার সংঘটিত হয়ে গেল! ধরাও পড়ে গেল তারা। লোকমুখে ফতোয়া এল যে, যুবককে পাথর ছুড়ে হত্যা করতে হবে। কিন্তু যুবকটির বাপ একশটি বকরী ও একটি ক্রীতদাসী মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিল। অতঃপর উলামাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে, যুবকটিকে ১০০ চাবুক লাগিয়ে এক বছর নির্বাসনে পাঠাতে হবে। আর বধূটিকে পাথর ছুড়ে হত্যা করতে হবে।

মহিলাটির স্বামী ও যুবকটির বাপ আল্লাহর রসূল-এর নিকট এসে মহান আল্লাহর কিতাবের ফায়সালা জানতে চাইল। তিনি বললেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ رُدُّ، وَعَلَى ابْنِكَ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ ... عَامٍ، وَاعْدُ يَا أَنْتَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفْتَ فَارْجُمُهَا

অর্থাৎ, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ আছে! আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব দিয়ে ফায়সালা করব। বাঁদী ও বকরী তুমি ফিরে পাবে। তোমার ছেলেকে একশ চাবুক লাগিয়ে এক বছর নির্বাসনে পাঠাতে হবে। আর হে উনাইস! তুমি সকালে এর স্ত্রীর কাছে যাও। অতঃপর সে যদি ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে, তাহলে তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করে দাও।” সুতরাং সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করলে তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হল। (বুখারী ২৬৯৫, মুসলিম ৪৫৩ ১নং)

অনুরূপ বিবাহিত-অবিবাহিত সমকামী ও পশুগমনকারীর সাজাও মৃত্যুদণ্ড।

আল্লাহর রসূল বলেন, "তোমরা যে ব্যক্তিকে লুত নবীর উম্মতের মত সমকামে লিপ্ত পাবে সে ব্যক্তি ও তার সহকর্মীকে হত্যা করে ফেলো।" (আহমাদ, আবু দাউদ ৪৪৬২, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ২৫৬১ বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ৬৫৮৯নং)

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তিকে কোন পশু-সঙ্গমে লিপ্ত পাবে, সে ব্যক্তি ও সে পশুকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে।" (তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬৫৮৮নং)

কেউ কোন সতী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিলে, তার সাজা হল আশি চাবুক। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ (النور)

অর্থাৎ, যারা সাধু রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশি বার কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী। (নূর: ৪)

আর এ হল মানুষের পঞ্চপ্রয়োজনীয় জিনিসের অন্যতম, মান রক্ষার তাকীদ।

৭। ইসলাম মানুষের ধনরক্ষার তাকীদ দেয়। অন্যের ধন ভক্ষণকে হারাম ঘোষণা করে। সূদ, ঘুস, জুচোরি প্রভৃতি বাতিল উপায়ে পরের ধন গ্রহণ করতে নিষেধ করে। নিষেধ করে চুরি করতে। ঘোষণা করে চোরের শাস্তি।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءِ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ (৩৮ } (সূরা المائدة

অর্থাৎ, চোর এবং চোরনীর হাত কেটে ফেলো, এ তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর
তরফ হতে শাস্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (মায়িদাহঃ ৩৮)

আর এ বিধান আপাতদৃষ্টিতে কঠোর মনে হলেও তা কার্যকর করার দ্বারা সহজেই চোর শ্রেণি
ভয় পাবে এবং চুরি করা থেকে বিরত থাকবে।

এ ছাড়া ডাকাতি, রাহাজানি, ছিন্তাই প্রভৃতির মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে ফাসাদ ছড়ায়, তাদের
জন্য রয়েছে পৃথক শাস্তি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (৩৩ } (المائدة

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে
(অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়) তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা গুলে চড়ানো
হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ
হতে নির্বাসিত করা হবে। ইহকালে এটাই তাদের

লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। (সূরা মায়িদাহ ৩৩)

আর এ হল মানুষের পঞ্চপ্রয়োজনীয় জিনিসের অন্য তাকীদ।

হজ্জ শুধু মুসলিম নয় সকল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষের জন্য সারা বিশ্বের এক মহা সম্মেলন।

মহান আল্লাহ বিশ্বজগতের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, লালনকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি সমুদয় বস্তুর মালিক ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন, ‘তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন, তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপাশ্রিত, মহাত্মশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহতাআলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামগুলো তারই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তার পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।’ (সূরা হাশর, আয়াত ২২-২৪)

প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে আরো বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত ধীন (আনুগত্যের বিধান বা জীবন ব্যবস্থা)।’ (সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৯)

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নহে তাই তিনি বলেন, ‘কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না।’ (সূরা আল ইমরান, আয়াত ৮৫)

আমাদের সমাজে ইসলামের সুবিধাজনক অংশ অনুসরণ করার প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায় যদিও ইসলামের কোন অংশবিশেষ নয় পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামের অনুসারী হতে মহান আল্লাহ তাগিদ দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’ (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২০৮)

আল্লাহতায়ালা মানব কল্যাণে ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ হিসেবে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ‘ইসলাম’কে নির্বাচন করেছেন। ইসলাম সকল প্রকার সমস্যা ও জটিলতামুক্ত এবং সহজতর একটি ধীন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ব্যাপারে সহজতা চান, জটিল বা কঠিনতা চান না।’ (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৫)

আর তিনি ধীন ইসলামকে পরিপূর্ণও করেছেন যার ঘোষণা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে রাসুল (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণে ‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করলাম; আর তোমাদের জন্য ইসলামকে ধীন হিসেবে নির্বাচন করলাম।’ (সূরা মায়েদা, আয়াত ৩)

ইসলামের পরিপূর্ণতার জন্য ৫টি রুকন বা ভিত্তি রয়েছে তার মধ্যে হজ্জ অন্যতম।

হজ্জ আরবি শব্দ। এটির মূল অক্ষর ৩ টি যথা ح ح ح যেটির শাব্দিক অর্থ মিলন, সম্মেলন, সাক্ষাৎ ইত্যাদি।

আর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মহান আল্লাহ নিজেই বলেন ‘আর আল্লাহর জন্য মানুষের উপর পবিত্র ঘরের হজ্জ করা (অবশ্য) কর্তব্য; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা অস্বীকার করে (তাহলে সে জেনে রাখুক) আল্লাহ্ সারা বিশ্বের কোন কিছুই পরওয়া করেন না’। (সূরা আল-ইমরানঃ ৯৭)

অর্থাৎ যিনি হজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা দেওয়া থেকে শুরু করে জিলহজ মাসের ৮-৯ তারিখ পর্যন্ত হজ্জের নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে নিজ বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত হজ্জের যাবতীয় খরচ এবং পরিবারের খরচ বহন করতে সামর্থবান তার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা হজ্জ ফরজ করেছেন এবং সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ পালন না করলে সতর্কতাও জারি করেছেন। হজের গুরুত্ব এত যে, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা হজ্জের মহাত্মা ঘোষণা করতে বিশ্বনবি এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু কে নির্দেশ দেন।

‘এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের জন্যে ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে।’ (সূরা হজ্জঃ ৯৭)

কোন ঝগড়া বিবাদ বা গর্হিত কাজ নয় বরং হজ্জ একটি মহা সম্মেলনের স্থল।

- ‘হজ্জে কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীও সাথে নিরাভরণ হওয়া জায়েজ নয়। না অশোভন কোন কাজ করা, না ঝগড়া-বিবাদ করা হজ্জের সেই সময় জায়েজ নয়। আর তোমরা যাকিছু সংকাজ কর, আল্লাহ তো জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাক, হে বুদ্ধিমানগন! তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অশেষণ করায় কোন পাপ নেই।’ (সূরা আল বাক্বারাহ:197)

হজ্জ বা সম্মেলনের স্থান নির্দিষ্ট করে আল্লাহ বিভিন্ন আয়াত নাজিল করেছেন তার মধ্যে অন্যতম - ‘নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তাআলার নিদর্শন গুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কাবা ঘরে হজ্জ বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ তাআলার অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মূল্য দেবেন।’ (সূরা আল বাক্বারাহ:158)

পৃথিবীতে ২০০ অধিক রাষ্ট্র রয়েছে। সব দেশেই প্রায় মুসলিম রয়েছে এবং সবদেশ থেকেই প্রায় মুসলিমরা হজ্জ পালন করতে পবিত্র মক্কা নগরীতে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয়। আবার অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও তাদের বিভিন্ন পন্য এবং সেবা সমূহ নিয়ে উপস্থিত হয় বানিজ্যিক উদ্দেশ্য

- ‘তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ (বাণিজ্য) অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই। অতঃপর যখন তওয়াফের জন্য ফিরে আসবে আরাফাত থেকে, তখন মাশআরে-হারামের নিকটে আল্লাহকে স্মরণ কর। আর তাঁকে স্মরণ কর তেমনি করে, যেমন তোমাদিগকে হেদায়েত করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে অজ্ঞ।’ সূরা আল বাক্বারাহ:198

মহান হজ্জ কে মহা সম্মেলন এবং নিরাপত্তা স্থল হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

- ‘যখন আমি কাবা গৃহকে মানুষের জন্যে সম্মিলন স্থল ও শান্তির আলয় করলাম, আর তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।’ (সূরা আল বাক্বারাহ:125)

ইসলাম উদার ও মানবিকতাসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ দীন। কোনোরূপ সংকীর্ণতা বা বাড়াবাড়ির জায়গা ইসলামে নেই। মানব জাতির বৃহত্তর কল্যাণের নিমিত্তে ইসলামের আগমন। অন্ধকার ও জাহালত থেকে মুক্ত করে মানব জাতিকে সত্যের দিশা দিতে মহামহিম আল্লাহ ইসলামকে নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ বলেন, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা বা কঠোরতা চাপিয়ে দেননি।’ (সূরা হজ, আয়াত ৭৮)

ইসলাম সংকীর্ণতা নয় বরং সার্বজনীনতায় বিশ্বাসী। হজ্জ শুধু মুসলিমদের ইবাদত নয় সকল ধর্ম বর্ন নির্বিশেষের জন্য সারা বিশ্বের এক মহা সম্মেলন।

©প্রথম পাতা » জীবনযাপন

মুহাম্মদ আল্-হেলাল।

হজ্জ নতুন কোন বিধান নয়, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের আগে থেকেই মক্কার মুশরিকরা হজ্জ পালন করতো। তারাও এটা ইবাদত হিসেবে পালন করতো। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বরকতময় জন্মের পরে নতুন করে যখন মক্কার মুশরিকরা কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণ করে তখন তারা সম্পূর্ণ হালাল টাকা ব্যবহার করেন।

বর্তমান বিশ্বে এমন কোন ধর্মীয় সম্মেলন হয়না যেখানে হজ্জের মতো লাখ লাখ মানুষ জমায়েত হয়, যেখানে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সামর্থবান মুসলিম রা উপস্থিত হয়, সকলেই একই রঙের সাদা পোশাক পরিধান করে, একই নিয়ম মেনে সকলেই একসাথে কাতার/সারি বদ্ধ হয়ে তাদের সালাত আদায় করে। আর লাখো মানুষের এমন জমায়েতকে নিরাপত্তার স্থল হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। কেননা সেখানে লাখো মানুষের উপস্থিতি থাকা

সত্বেও কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়না। এর মাধ্যমে বিশ্বের সকল প্রান্তে থাকা মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক তৈরি হয়। আর এমন অকাট্যভাবে বিধান পালিত হতে অন্যান্য ধর্মে দেখা যায় না।

সুতরাং বর্তমান পৃথিবীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সকল ধরনের হানাহানি সংকট নিরসনে এই হজ্জ তথা বিশ্ব সম্মেলন রাখতে পারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

যাকাত প্রদানে ইসলামের সৌন্দর্য :

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের একটি যাকাত। এর অর্থ বৃদ্ধি করা, পবিত্র করা। ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী ধনীদের সম্পদে গরীবের হক(অধিকার) রয়েছে। আর সেটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারিত যেটা দরিদ্র কে দান করা বাধ্যতামূলক। আর তা হলো যাকাত। আল্লাহ সুবহানাহু তায়াল্লা যাকাতের এই বিধানকে ধনী-গরীবের মাঝে সেতু বন্ধনস্বরূপ করে দিয়েছেন।

[OBJ]

কুরআনে যাকাত শব্দটি ৩০ বার উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৭ বার একই আয়াতে নামাজের সাথে যুক্ত। এক জায়গায়, যাকাত শব্দটি "নামাজ" শব্দটির সাথে একই ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হয়েছে: "যারা তাদের নামাজে বিনয়ী হয়" এবং "যারা প্রকৃতপক্ষে যাকাত প্রদানে সক্রিয়।"

কুরআনে উল্লেখিত ৩০টি আয়াতের মধ্যে আটটি মক্কার আয়াত এবং বাকিগুলো মদীনার আয়াত - যা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, একজন মুসলিমের জন্য নামাজের পরেই যাকাত গুরুত্বপূর্ণ।

কিছু লেখক দাবি করেন যে কুরআনে ৮২ বার নামাজের সাথে যাকাত জড়িত, কিন্তু এটি স্পষ্টতই অতিরঞ্জিত। এমনকি যদি আমরা এমন জায়গাগুলি অন্তর্ভুক্ত করি যেখানে যাকাতের অন্তর্নিহিত উল্লেখ রয়েছে, যেখানে ব্যয়, ধার দেওয়া বা খাওয়ানোর মতো শব্দগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও আমরা সেই প্রশংসিত সংখ্যায় পৌঁছাতে পারব না।

যদিও সদকা (বহুবচন, সদকা) জাকাত থেকে আলাদা, যার মধ্যে কেবল দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য বস্তুগত ও আর্থিক সম্পদের বন্টন বা ভাগাভাগি জড়িত। সদকাতে, উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও, সদয় কথা বলা, প্রাণী বা পরিবেশের যত্ন নেওয়া, কারো দিকে হাসিমুখে কথা বলা ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে আনন্দ ভাগাভাগি করাও জড়িত। কিন্তু যাকাতের বিপরীতে, সদকা বাধ্যতামূলক নয়।

উভয়ই আধ্যাত্মিক শুদ্ধি অর্জনের এবং একজন মুসলিমকে তাদের পাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার উপায় হিসাবে ধরে নেওয়া ইবাদতের একটি রূপ হিসেবে কাজ করে।

★যাকাতের ইতিহাস:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে আগমনের প্রায় ১৮ মাস পর, ২ হিজরীতে যাকাত আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। এর আগে মক্কার যুগে দান-খয়রাত কেবল সুপারিশ করা হত। মদীনাতে হিজরতের পর আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন, “(হে মুহাম্মদ), তাদের সম্পদ থেকে দান গ্রহণ করো, যার মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং তাদের বৃদ্ধি করবে এবং তাদের উপর [আল্লাহর রহমত] প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তোমার প্রার্থনা তাদের জন্য আশ্বাসস্বরূপ। আর আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।” [সূরা তাওবা: ১০৩]

যদি আপনি যাকাতের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন, তাহলে যাকাত সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তী নিবন্ধটি দেখুন।

[OBJ]

আসুন আমরা কিছু উদাহরণ দেখি যে, আল্লাহ আমাদের কাছে যাকাত সম্পর্কে কীভাবে বর্ণনা করেন:

"আমার রহমত সকল কিছু উপর বিস্তৃত। আমি অবশ্যই তাদের জন্য এই রহমত লিখে দেব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার নিদর্শনগুলিতে বিশ্বাস করে।" [সূরা আল-আ'রাফ, ১৫৬]

যারা তাঁর (কার্য) সাহায্য করে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন; কারণ আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী, (তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নে সক্ষম)। (তারা) সেইসব লোক যাদেরকে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি, তাহলে তারা নিয়মিত নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর হাতে।" [সূরা আল-হজ্জ, ৪০-৪১]

"তবুও যদি তারা তওবা করে, নিয়মিত নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।" [সূরা তাওবা, আয়াত: ১১]

"মুমিন পুরুষ ও নারী একে অপরের অভিভাবক। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। তারা নিয়মিত নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। আল্লাহ তাদের উপর তাঁর রহমত বর্ষণ করবেন। কারণ আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা তাওবা। ৭১]

"আল্লাহর মসজিদগুলো তারাই আবাদ করবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, নিয়মিত নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।" [সূরা তাওবা, আয়াত: ১৮]

সকল আয়াতেই আমরা একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি যে 'সদকা' এবং 'যাকাত' শব্দ দুটি বহুবার পরস্পরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে - এবং কখনও কখনও একে অপরের থেকে পৃথক।

'সদকা' (পাঁচ) এবং 'সদকাত' (আট) শব্দটি কুরআনে ১৩ বার এসেছে।

যাকাত বনাম সাদাকাহ - পার্থক্য কী?

লিসান আল আরব গ্রন্থে বলা হয়েছে, “আরবীতে যাকাত শব্দের মূল অর্থ পবিত্রতা, বৃদ্ধি, আশীর্বাদ এবং প্রশংসা। কুরআন ও হাদিসে এই শব্দের এই সমস্ত অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে।” যদিও আল-ওয়াহিদী এবং অন্যান্যদের মতে, “যাকাত” শব্দের মূল অর্থ বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধি এবং এটি বিভিন্ন দিকে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অন্যদিকে, সাদাকাহ শব্দটি 'সাদক' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ সত্য। যাকাতের তুলনায় সাদাকার সংজ্ঞা আরও সাধারণ, যেখানে এটি প্রকৃতিতে আরও সীমাবদ্ধ।

উদাহরণস্বরূপ, কারিগরি দৃষ্টিকোণ থেকে, যাকাত বলতে বাধ্যতামূলক দানকে বোঝায় যেখানে সাদাকাহ বলতে স্বেচ্ছাসেবী দানকে বোঝায়। এমনকি হাসিমুখে রাস্তা থেকে ক্ষতিকারক কিছু সরিয়ে ফেলার মতো অ-আর্থিক দানকেও সাদাকাহ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

মূলত সকল যাকাতই সাদাকা হিসেবে বিবেচিত হয়, কিন্তু সকল সাদাকাহ অবশ্যই যাকাত নয়। এই কারণেই যোগ্য শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ যারা আমাদেরকে সুন্নাহ অনুসারে পার্থক্য করতে সাহায্য করতে পারেন, আল্লাহ কুরআনে কী উল্লেখ করছেন। শেখ আবদুল্লাহ শিনকিতি বলেন, "সর্বোত্তম দান গোপনে করা হয়, আর সর্বোত্তম যাকাত প্রকাশ্যে করা হয়।"

কেন? কারণ দানের কোন সীমা নেই, এবং এটি একজন ব্যক্তি এবং তার প্রতিপালকের মধ্যে। অন্যদিকে যাকাত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং ইসলামের একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত। জনসমক্ষে যাকাত আদায় করা দেখা গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদেরও এটি অনুসরণ করার জন্য উৎসাহিত করার একটি উপায় হিসেবে এবং সমাজের দরিদ্রদের মধ্যে হিংসা বা সন্দেহ দূর করতে সাহায্য করে।

যাকাতকে কর, জরিমানা বা জরিমানা হিসেবে দেখা উচিত নয়। বরং, যাকাত প্রদান করলে কারো সম্পদ কমে না, বরং আল্লাহ বলেন যে আমাদের সম্পদ বরকতময় এবং পবিত্র হবে। যদিও এটা কারো কারো কাছে বোঝা কঠিন মনে হতে পারে - কিন্তু মনে রাখবেন যে আমাদের, মানুষের, কেবল পিক্সেল আছে যখন আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ ছবি আছে।

আল্লাহ আমাদের কুরআনে বলেছেন, "কিন্তু তোমরা আল্লাহর মুখ দেখে যাকাতের মাধ্যমে দান করো, তা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে" [সূরা আল-রুম, ৩৯]

"আল্লাহ সুদকে সকল নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করবেন কিন্তু দান-খয়রাত বৃদ্ধি করবেন: কারণ তিনি অকৃতজ্ঞ ও পাপিষ্ঠকে ভালোবাসেন না।" [সূরা আল-বাকারা, ২৭৬]

[OBJ]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের স্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে দান করলে সম্পদ কমে না। এর জন্য আমাদের আর কী গ্যারান্টি বা প্রেরণা প্রয়োজন? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দান করলে সম্পদ কমে না, কেউ কাউকে ক্ষমা করে না, আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করেন না, আর কেউ আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় না, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন না।" [মুসলিম]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি কেউ সৎকর্মের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুরের সমান দান করে এবং আল্লাহ কেবল সৎকর্মের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ গ্রহণ করেন, তাহলে আল্লাহ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন এবং দানকারীর জন্য এর সওয়াব বৃদ্ধি করেন, যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চা লালন-পালন করে, এমনকি তা পাহাড়ের সমান হয়ে যায়।” [বুখারী]

যাকাত আইন থেকে আমরা যে জ্ঞান বা শিক্ষা নিতে পারি তা হলো, আল্লাহ আমাদের হৃদয় থেকে লোভ দূর করতে চান। যাকাত আমাদের অর্থকে পবিত্র করে এবং আমাদের জন্য তা পরিষ্কার করে। যে সম্পদের যাকাত পরিশোধিত হয় না, তা আল্লাহর দৃষ্টিতে অপবিত্রতার মতো। যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত দেয় না, সে যেন তার পরিবারকে অপবিত্রতা খাওয়াচ্ছে।

আল্লাহ আমাদের বলেন, “তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করো, যার মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র ও পবিত্র করো।” [সূরা তাওবা, আয়াত: ১০৩]

যাকাত কি ঈমানের নিদর্শন?

হ্যাঁ, যাকাত ঈমানের সবচেয়ে বড় নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি। আমরা যখনই টাকা দান করি, তখন আমরা কিছু না কিছু পাওয়ার আশা করি। কিন্তু যখন আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কোনও শারীরিক প্রতিদানের আশা না করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য টাকা দান করি, তখন আমরা এই

বিশ্বাসের উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করি যে, আল্লাহ আমাদের তাঁর অনুগ্রহ থেকে প্রতিদান দেবেন, এমনকি যদি আমরা তা দেখতে না পাই।

যাকাত প্রদান সমাজের দুর্বল অংশগুলিকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য তহবিল সরবরাহ করে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নির্ভরশীলতা চক্র ভাঙতেও সাহায্য করে।

শরীয়ত মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে আমাদের পরিবার এবং নির্ভরশীলদের যত্ন নেওয়া আমাদের দায়িত্ব - প্রিয়জনদের খরচ করা এবং তাদের যত্ন নেওয়া দান করার মতো। একইভাবে, যাকাতের মাধ্যমে, আমাদের সহ-মুসলিমদের দান করা আমাদের চারপাশের একটি বৃহত্তর পরিবারকে যত্ন এবং সহায়তা দেওয়ার মতো। এটি আমাদের চারপাশের সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়িত করে এবং গড়ে তোলে, পাশাপাশি আত্মীয়তা এবং বন্ধুত্বের দৃঢ় বন্ধনকে শক্তিশালী এবং বজায় রাখে।

আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা বর্ণনা করেন: লোকেরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সদকা নিয়ে আসত, তখন তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ! তাদের উপর তোমার রহমত বর্ষণ করো।" একবার আমার বাবা তাঁর সদকা নিয়ে তাঁর কাছে এলেন, তখন তিনি অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আল্লাহ! আবু আওফার পরিবারকে বরকত দান করো।" [বুখারী]

যাকাত আয়কে শুদ্ধ করে এবং বরকত বয়ে আনে:

[OBJ]

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি, যাকাত কেবল একটি কর্তব্য নয় বরং এটি একজন ব্যক্তির সম্পদ ও আত্মাকে পবিত্র করার একটি মাধ্যম। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে তাদের উপার্জনের একটি অংশ দান করে তারা তাদের আয়কে পবিত্র করে এবং বরকত অর্জন করে। এই দানশীলতার গভীর আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাব রয়েছে, যা এটিকে ইসলামী অনুশীলনের ভিত্তিপ্রস্তর করে তোলে।

কী Takeaways

যাকাত ইসলামের একটি স্তম্ভ যা সম্পদ এবং আত্মা উভয়কেই পবিত্র করে।

এটি সম্পদের পুনর্বণ্টন এবং দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করে।

যাকাত প্রদান সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করে এবং উদারতা বৃদ্ধি করে।

কুরআন ও হাদিস উভয় স্থানেই যাকাতের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা এর গুরুত্ব তুলে ধরে।

যাকাতের সঠিক হিসাব এবং বন্টন এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

যাকাতের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

[OBJ]

আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন:

যাকাত কেবল একটি আর্থিক বাধ্যবাধকতা নয়; এটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক অনুশীলন। নিজের সম্পদের একটি অংশ দান করে একজন মুসলিম স্বীকার করে যে তার যা কিছু আছে তা আল্লাহর। এই দানের কাজ আল্লাহর সাথে গভীর সংযোগ গড়ে তোলে এবং দাতাকে অভাবীদের সাহায্য করার তাদের কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আত্মার শুদ্ধিকরণ:

যাকাতের অন্যতম প্রধান উপকারিতা হল এটি সম্পদ এবং আত্মা উভয়কেই পবিত্র করে। যখন একজন ব্যক্তি যাকাত প্রদান করেন, তখন এটি তাদের সম্পদকে সমস্ত অপবিত্রতা থেকে পরিষ্কার করে এবং তাদের হৃদয় থেকে বস্তুগত সম্পদের প্রতি ভালোবাসা দূর করতে সাহায্য করে। এই আধ্যাত্মিক পবিত্রতা বিনয় এবং নিঃস্বার্থতার অনুভূতিকে উৎসাহিত করে। যাকাত প্রদান হল আল্লাহর ইচ্ছার জন্য আপনার সম্পদকে পবিত্র করার একটি উপায়, এই স্বীকৃতি দিয়ে যে আমাদের যা কিছু আছে তা তাঁরই।

কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধি করা:

কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধিতেও যাকাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দরিদ্রদের দান করার মাধ্যমে, দাতা তাদের নিজস্ব আশীর্বাদ সম্পর্কে আরও সচেতন হন এবং কৃতজ্ঞতার অনুভূতি বিকাশ করেন। এই কৃতজ্ঞতা, পরিবর্তে, ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে এবং একটি সহানুভূতিশীল সম্প্রদায় গড়ে তোলে।

যাকাতের অর্থনৈতিক প্রভাব

সম্পদের পুনর্বণ্টন:

সমাজের মধ্যে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনে যাকাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পর্যাপ্ত সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিদের তাদের সম্পদের একটি অংশ অভাবীদের মধ্যে দান করার বাধ্যবাধকতা দিয়ে, এটি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান কমাতে সাহায্য করে। এই ব্যবস্থা নিশ্চিত করে যে সম্পদ গুটিকয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না থাকে বরং সমগ্র সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে পড়ে।

দারিদ্র্য হ্রাস:

যাকাতের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল দারিদ্র্য দূরীকরণ। দরিদ্রদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে, যাকাত ব্যক্তি ও পরিবারকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে। এটি কেবল তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে না বরং তাদের স্বাবলম্বী হতে এবং অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম করে।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রচার:

যাকাত দেশের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করতে পারে, খরচ, বিনিয়োগ বা সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করে, এবং এর ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। যখন যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ পুনর্বণ্টন করা হয়, তখন এটি অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে উদ্দীপিত করে। যাকাত গ্রহীতারা প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবার জন্য অর্থ ব্যয় করার সম্ভাবনা বেশি, যা স্থানীয় ব্যবসা এবং সামগ্রিক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে।

যাকাত সামাজিক কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের প্রতি ইসলামের নিষ্ঠার উদাহরণ, যা কেবল আর্থিক সাহায্যের বাইরেও বিস্তৃত সুবিধা প্রদান করে।

সংক্ষেপে, যাকাত কেবল ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাই পূরণ করে না বরং এর উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সুবিধাও রয়েছে। এটি একটি আরও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের প্রচার করে, দারিদ্র্য হ্রাস করে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে।

https://youtube.com/watch?v=p_Er5যসবচগ

যাকাত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত:

কুরআন প্রায়শই যাকাতকে নামাজের সাথে যুক্ত করে, ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে এর গুরুত্বের উপর জোর দেয়। উদাহরণস্বরূপ:

"আর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।"

সূরা আল বাকারা (২:৪৩)

বেশ কয়েকটি আয়াতে যাকাত ফরজ করার বিষয় এবং সম্পদ পবিত্র করা এবং অভাবীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আত-তাওবা (৯:১০৩) বলে,

"[হে মুহাম্মদ], তাদের সম্পদ থেকে দান গ্রহণ করো, যার মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং তাদের বৃদ্ধি করবে, এবং তাদের উপর [আল্লাহর রহমত] প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই, তোমার প্রার্থনা তাদের জন্য আশ্বাসস্বরূপ। আর আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।"

যাকাত সম্পর্কে নবীর শিক্ষা:

নবী মুহাম্মদের হাদিস, বাণী এবং কর্মকাণ্ডেও সাদাকা বা স্বেচ্ছাকৃত দান-খয়রাতের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা যাকাতের মতোই অভাবীদের জন্য। যাকাত সম্পর্কে কিছু জনপ্রিয় হাদিসের মধ্যে রয়েছে:

"যাকাত দিলে মানুষের সম্পদ কমে না" (সহীহ বুখারী)

"যে ব্যক্তি যাকাত দেয়, আল্লাহ তার সম্পদ বৃদ্ধি করে দেবেন" (সহীহ বুখারী)

"সর্বোত্তম দান হলো নিজের সম্পদের যাকাত দেওয়া" (সহীহ মুসলিম)

"যাকাত হলো ধনীদের উপর গরীবদের অধিকার" (সহীহ বুখারী)

"সারা বছর দান করার চেয়ে যাকাত দান করা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়" (সহীহ বুখারী)

যাকাতের সামাজিক উপকারিতা

সম্প্রদায়ের বন্ধন শক্তিশালী করা

যাকাত সম্প্রদায়ের বন্ধনকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের সম্পদের একটি অংশ দান করে, ধনীদের দরিদ্রদের সহায়তা করার তাদের কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়। এই দান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য এবং পারস্পরিক সহায়তার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

উদারতাকে উৎসাহিত করা

যাকাতের অন্যতম প্রধান সামাজিক সুবিধা হলো এটি উদারতাকে উৎসাহিত করে। যখন মানুষ তাদের অবদানের ইতিবাচক প্রভাব দেখতে পায়, তখন তারা দান চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এটি উদারতার একটি চক্র তৈরি করে যা সম্প্রদায়ের সকলের জন্য উপকারী।

একটি সহানুভূতিশীল সমাজ গড়ে তোলা

যাকাত একটি সহানুভূতিশীল সমাজ গঠনে সাহায্য করে। দরিদ্র ও দুর্বলদের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে, এটি নিশ্চিত করে যে প্রত্যেকেরই মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার সুযোগ রয়েছে। এটি কেবল অভাবীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে না বরং আরও যত্নশীল এবং সহানুভূতিশীল সম্প্রদায় তৈরি করে।

যাকাত সামাজিক কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক ন্যায্যবিচারের প্রতি ইসলামের নিষ্ঠার উদাহরণ, যা কেবল আর্থিক সাহায্যের বাইরেও বিস্তৃত সুবিধা প্রদান করে।

© ব্লগ হোম: মোহাম্মদ জাহিদ মতিন)

সাধারণত কাউকে উপহার দেওয়া কিংবা বিপদে সাহায্য করার মাধ্যমে খুব দ্রুতই গভীর সম্পর্ক তৈরি থাকে। একজন মুমিন বান্দা যদি ধনী হয়ে থাকে তখন তার উপর যাকাত ফরজ করা হয়েছে এজন্য যে সে তার সম্পদের একটা অংশ যাকাত হিসেবে দরিদ্রকে দিবে এতে করে সেই দরিদ্র ব্যক্তির দারিদ্র্যতা দূর হবে। প্রত্যেক ধনী মুমিন ব্যক্তি যখন এই হক আদায় করবে তখন একটা সময় পর সমাজে দরিদ্র ব্যক্তি হ্রাস পাবে। এবং এরই ফলশ্রুতিতে ধনী-গরিবের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে।

অপরদিকে পশ্চিমা শাসক কর্তৃক প্রচলিত 'সুদ' প্রথা সমাজে ধনী-গরিবের মাঝে বৈষম্য বৃদ্ধি করে, সমাজে অস্থিতিশীলতা তৈরি করে, সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। কেননা সুদ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সম্পদশালীদের সম্পদ বৃদ্ধি পায় আর দরিদ্রদের দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়। কারণ একজন দরিদ্র ব্যক্তি অভাবের তাড়নায় অভাব মুচন করতে সমাজে প্রচলিত নিকৃষ্ট সুদ প্রথার শরণাপন্ন হয়ে ঋণ নেয়। নির্দিষ্ট সময় পর সে ঋণ পরিশোধ না করার দরুন তার সুদের প্রক্রিয়ায় ঋণ বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফলে একসময় সে ঋণ পরিশোধ করতে নিজের সবকিছু বিক্রিও করে দেয়, অতঃপর সে পূর্বের থেকেও দরিদ্র হয়ে যায়।

এর মাধ্যমে এক পক্ষ খুব দ্রুত অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং অপরপক্ষ খুব দ্রুত ধনবান হয়।

এজন্যই ইসলামে টাকার বিনিময়ে যেকোনো ধরনের খেলা যেটা 'জুয়া' নামে পরিচিত সেটা হারাম করা হয়েছে।

জ্ঞানীজন পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝতে পারবে ইসলামে যাকাতের সৌন্দর্য।

পোশাক নির্বাচনে ইসলামের সৌন্দর্য:

মানুষ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরার জন্য প্রাকৃতিকভাবে যেসব প্রয়োজন অনুভব করে তার একটি পোশাক। পোশাক পরিধানে সর্বোচ্চ শালীনতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবাই সমান। কারো জন্য পোশাকের শালীনতায় কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হয়নি। নারী-পুরুষ সবাই আল্লাহ প্রদত্ত শালীনতা বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

নারীর পোশাকে শালীনতার বিষয়টিতে জোর দিলেও অনেকেই মনে করেন এক্ষেত্রে পুরুষের জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অথচ মানব জাতির আদি পিতা ও আদি মাতা জান্নাত থেকে বের হওয়ার পর দুজনেই একসঙ্গে নিজের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেন এবং গাছের পাতায় নিজেদের শরীর ঢেকে নেন।

পবিত্র কোরআনে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে এভাবে—

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَ نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَ أَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ

...অতঃপর যখন তারা সেই বৃক্ষফলের আশ্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল...।’ (সূরা আরাফ, আয়াত : ২২)

সচেতন সমাজের সবাই পোশাকের শালীনতা বজায় রেখেই চলেন। পোশাকের শালীনতায় সবাই সমান হলেও নারী-পুরুষের গঠন ও আকৃতিগত পার্থক্যের কারণে পোশাকের ধরনে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

সাধারণত নারী যেমন পোশাক পরিধান করে থাকেন পুরুষ একই ধরনের পোশাক পরেন না। আবার নারীও পুরুষের মতো পোশাক পরেন না। এই ভিন্নতা বজায় রাখার নির্দেশ হাদিসেও দেওয়া হয়েছে। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত—

আল্লাহর রাসূল সা. লানত করেছেন সেই পুরুষের ওপর যে মেয়েলী পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীর ওপর, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫৮৮৬)

তাই নারী-পুরুষকে শালীনতার পাশাপাশি নিজেদের পোশাক ও স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে হবে।

পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামের মূল নির্দেশ হলো নিজেকে ঢেকে রাখা এবং অন্যকে আকর্ষণ করতে পারে এমন কিছু প্রকাশ না করা। ক্ষেত্রে পুরুষকে পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে নজরের হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَرَادَ اللَّهُ بِمَا يَصْنَعُونَ

অর্থাৎ, ‘(হে নবী!) আপনি ঈমানদার পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং যৌনাস্থানের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য উত্তম পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ এ ব্যাপারে অবগত। আর ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং যৌনাস্থানের হেফাজত করে।’ (সূরা নুর, আয়াত : ৩০)

পাপের প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হয় দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে। এজন্য পুরুষকে দৃষ্টির হেফাজাতের কথা বলা হচ্ছে। হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বনী আদমের উপর কিছু কিছু ব্যভিচার (যিনা) হবে জানিয়ে দিয়েছেন, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। চক্ষুর যিন হল তাকানো, ...। (বুখারি, ৬২৪৩, ৬৬১২, মুসলিম, হাদিস : ২৬৫৭)

বিশৃঙ্খলা এড়াতে তাই আল্লাহ তায়ালা দৃষ্টির হেফাজতের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।

পুরুষের প্রতি দৃষ্টি হেফাজতের নির্দেশের পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা নারীকেও তার সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। পর-পুরুষ যেন তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব না করে তাই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে—

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا لِيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى خُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

‘আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফায়ত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে।’ (সূরা নুর, আয়াত : ৩১)

কোরআনের আয়াতের প্রেক্ষিতে মুফাসসিরগণ বলেন, নারীর এমন শালীন পোশাক বা এমন বোরকা পরিধান

করা উচিত যাতে তার পুরো শরীর ঢেকে থাকে। পবিত্র কোরআনের আরেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۖ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

‘হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের (সর্বাপেক্ষ আচ্ছাদনকারী পোশাক) একটা অংশ নিজেদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। যেন তাদেরকে (স্বাধীন নারী হিসেবে) চেনা সহজতর হয়। ফলে তাদেরকে উদ্ভুক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সূরা : আহজাব, আয়াত : ৫৯)

আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, ‘পরপুরুষকে সাজসজ্জার কোনো কিছু দেখাবে না। তবে যা লুকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয় সেটা ছাড়া।’ (তাফসিরে ইবনে কাসির)

উপরে উল্লেখিত আয়াতে নারীর শারীরিক সৌন্দর্যের মতো তার পোশাকসহ অন্যান্য সৌন্দর্য গোপন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং নারী-পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষক পোশাক পরিধান থেকে বিরত থাকতে হবে।

অন্যকে আকর্ষণ করে এমন পোশাকে পুরুষের ক্ষেত্রেও একই বিধান। অর্থাৎ, আকর্ষণ করে এমন পোশাক পরিধান থেকে পুরুষকেও বিরত থাকতে হবে এবং নিজের চোখের হেফাজত করতে হবে।

পোশাক ও শালীনতার বিধান মানার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বিশৃঙ্খলা এড়ানোর পাশাপাশি এর মাধ্যমে তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতি অর্জন হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এমনই বলেছেন। বর্ণিত হয়েছে—

بَنَىٰ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَ رِيثًا ۖ وَ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ ۖ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

‘হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদের পোশাক দিয়েছি এবং তাকওয়ার পোশাক—এটাই সর্বোৎকৃষ্ট।’ (সূরা আরাফ, আয়াত : ২৬)

অর্থাৎ, বাহ্যিক পোশাকের মাধ্যমে গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করা ও সাজ-সজ্জা করার আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া ও আল্লাহভীতি। এ আল্লাহভীতি পোষাকের মধ্যেও এভাবে প্রকাশ পায়। তাই পোষাকে যেন গুপ্তাঙ্গগুলি পুরোপুরি আবৃত হয়। উলঙ্গের মত দৃষ্টিগোচর না হয়। অহংকার ও গর্বের ভঙ্গিও না থাকা চাই। অপব্যয় না থাকা চাই। এর প্রত্যেকটির ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিসে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে

অন্যান্য ধর্মে শালীনতার কথা বললেও দৃষ্টির হেফাজত করার উপর কোন গুরুত্বারোপ করে না। ফলে যে কেউ চাইলেই অন্যের দিকে অবাধে দৃষ্টিপাত করতে পারে। আর এর মাধ্যমে অশ্লীলতার প্রসার ঘটে খুব সহজেই। আর অন্যান্য ধর্মের শালীনতা আর ইসলামের পর্দার

বিধানে পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলাম প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য ব্যক্তি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যাদের সামনে শালীন ভাবে চলাফেরা করার দ্বারা তাদের মনে কুপ্রভাব পড়বে না। তাই ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের সাথে কথা-বার্তা, আচার-আচরণে সংযত থাকার নির্দেশ প্রদান করে। এদের সাথে পর্দা করা আবশ্যিক করে দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তায়া'লা জানেন মানুষ অশালীনতার প্রসারের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে। ধার্মিক মুসলিমগণ আল্লাহর নির্দেশে পর্দার বিধান পালন এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এই কারণে হেনস্তার শিকার হচ্ছে। বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে মুসলিমদেরকে।

কিন্তু অন্যান্য ধর্মে এসব পর্দা করতে দেখা যায় না। বরং নারীদের পোশাকে শিথিলতা প্রদর্শন করার মাধ্যমে নারীদের সহজলভ্য করা হচ্ছে, যার ফলে বর্তমানে নারীরা বিভিন্ন স্থানে সম্মানহানীর স্বীকার হচ্ছে।

মৃত ব্যক্তির শেষ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম:

মাওলানা শিক্বীর আহমদ

কত শত বৈচিত্র্যের সমাহার আমাদের এ পৃথিবী! পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার হাজার হাজার সৃষ্টি। একেক সৃষ্টির একেক ধরন। একই প্রজাতির মধ্যে আবার কত ভিন্নতা! মানুষের কথাই যদি ধরি, কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ খাটো, কেউ লম্বা, কেউ উন্নত স্বাস্থ্যের অধিকারী, কারও দেহ হাড়জিড়জিড়ে। এসবের পাশাপাশি ধনী-গরীব শিক্ষিত-অশিক্ষিত ইত্যাদি আরও কত বৈচিত্র্যময় দিক। সবকিছু মিলিয়ে আমরা মানুষ, জগতের একটি ক্ষুদ্র সৃষ্টি। এমন আরও কত কিছু যে দয়াময় আল্লাহ সৃষ্টি করে রেখেছেন এ জগতে, সংখ্যা দিয়ে তা প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু যে বিন্দুটিতে এসে সকল বৈচিত্র্য মিলে একাকার হয়ে গেছে তা হচ্ছে-এ জগতের কোনোকিছুই চিরস্থায়ী নয়, কোনোটার আয়ু খুবই সামান্য, কোনোটা আবার টিকে থাকে বহু বছর, এমনকি অনেক শতাব্দী, তবুও সবই ক্ষণস্থায়ী, সবই ধ্বংসশীল। দিনের শেষে টিকে থাকবে না কিছুই। ব্যতিক্রম কেবলই আল্লাহর মহান সত্তা।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَ يُبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ.

ভূপৃষ্ঠে যা আছে সবই নশ্বর। অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব। -সূরা আররাহমান (৫৫) : ২৬-২৭

‘জন্মিলে মরিতে হইবে, অমর কে কোথা কবে’-এ কথাটি অস্বীকার করার সাধ্য নেই কারও। তাও শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, জগতের যত জীব, সবকিছুকেই গ্রহণ করতে হয় মরণের স্বাদ। পবিত্র কুরআনে এ চিরসত্যটি একাধিক স্থানে আলোচিত হয়েছে-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.

প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮৫

মানুষ মারা যাবেই। মৃত্যু অনিবার্য। অনস্বীকার্য এ বাস্তবতাটির ভেতর দিয়ে প্রত্যেকেই যাবে একাকী, কেউ কারও সঙ্গী নয়। দুনিয়ার এ ক্ষুদ্র জীবনে কতজনের সঙ্গে কতভাবে তার বন্ধন গড়ে ওঠে! মৃত্যু এসে সকল বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে তাকে একাকী তুলে নিয়ে যায়। দুনিয়ায় থেকে যায় পরিবারপরিজন-বাবা-মা ছেলে-মেয়ে স্বামী-স্ত্রী আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীসহ আরও কত আপনজন। এভাবে একে একে সকলেই চলে যায়। কেউ আগে, কেউ পরে। কিন্তু যায় সকলেই। যাদেরকে আপাতত রেখে যায় দুনিয়ার বুক, তাদের প্রতি মৃত ব্যক্তির কী হক, কী অধিকার-এটা নিয়েই আজকের আলোচনা।

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে আপনজনের করণীয়

মৃত্যু হচ্ছে মোহনা-এখানে দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি আবার আখেরাতের জীবনের সূচনা। দুনিয়াকে বলা হয় ‘মাযরাআতুল আখিরাহ’ বা আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। দুনিয়ার জীবন যার যেমন কাটবে, পরকালে এর ফলই সে ভোগ করবে। আর যে কোনোকিছু ভালো হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্যে এর সমাপ্তি সুন্দর হওয়া জরুরি। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ.

আমল তো শেষ অবস্থা অনুসারেই বিবেচিত হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৬০৭

আমাদের এক পরিচিত প্রবাদ-শেষ ভালো যার, সব ভালো তার। সবমিলিয়ে বলা যায়, আখেরাতে সুন্দর জীবনের জন্যে সুন্দর মৃত্যুর বিকল্প নেই। মৃত্যুর সময় যদি ঈমানটাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়, দুনিয়ার সব দুঃখ-কষ্ট তখন তুচ্ছ। আর যদি এর বিপরীত কিছু হয়, শয়তানের ধোঁকায় কেউ নিজের ঈমান খুইয়ে বসে, জগতে তার চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে! এজন্যে কোনো মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে যারা উপস্থিত থাকবেন, তাদের প্রথম কর্তব্য-কালেমায়ে তায়্যিবার তালকীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

তোমরা তোমাদের মৃত্যুগামী ব্যক্তিদের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র তালকীন করো। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯১৬, ৯১৭

তালকীনের অর্থ হচ্ছে-মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে একটু আওয়াজ করে কালেমা পড়তে থাকা। তবে মনে রাখতে হবে, এ অবস্থায় তাকে কিছুতেই মুখে উচ্চারণ করে কালেমা পড়ার আদেশ করা যাবে না। জোরাজুরি করা যাবে না; এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই নিয়ম হল, তার পাশে বসে মৃদু আওয়াজে কেবল কালিমা পড়তে থাকা। কালিমা বলুন বা এজাতীয় কিছু না বলা। তার পাশে যখন কালেমা পড়া হবে, তিনি যখন কালেমার আওয়াজ শুনতে পাবেন, আশা করা যায়, তিনি নিজেই কালেমা পড়ে নিতে পারেন। এ কালেমা যার জীবনের শেষ কথা হবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

যার শেষ কথা হবে-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩১১৮

মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে থেকে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করার কথাও হাদীসে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اقْرَأُوا (يَس) عَلَى مَوْتَكُمْ.

মৃত্যুপথযাত্রী যারা তাদের পাশে থেকে তোমরা সূরা ইয়াসীন পাঠ করো। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩১২৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৩০০২

ছোট ও সহজ এ দুটি আমলের পাশাপাশি দূরের-কাছের সকলেরই উচিত-তার জন্যে দুআ করা। তার মৃত্যু যেন সহজ হয় এবং ঈমানের সঙ্গে হয়-এ দুআ করা। এ দুআটুকুর জন্যে পাশে থাকারও প্রয়োজন নেই। কোনো আপনজনের মুমূর্ষু অবস্থার সংবাদ পেলে তার জন্যে যথাসাধ্য দুআ করা উচিত। এতে শুধু তারই উপকার হবে-এমন নয়; বরং দুআকারীর উপকারও এতে কম নয়। হাদীসের ভাষ্যানুসারে, কোনো মুসলিম ভাইয়ের জন্যে দূর থেকে কোনো দুআ করলে ফিরিশতারা বলে-তাকেও (দুআকারীকেও) যেন এ বিষয়গুলো দান করা হয়। তাই অন্য কারও জন্যে দুআ করা, কারও মুমূর্ষু অবস্থায় সহজ মৃত্যু এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুর জন্যে দুআ করলে লাভবান হবে দুআকারী নিজেও।

মৃত্যুর পর আপনজনদের করণীয়

মৃত্যু যেমন এক অনুপেক্ষ বাস্তবতা, মৃত্যুর জন্যে নির্ধারিত সময়ও কারও পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যার জন্যে যতটুকু হায়াত নির্ধারিত, যার মৃত্যুর জন্যে যে সময় লিখে রাখা হয়েছে, এ সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই কারও। পবিত্র কুরআনে একাধিক স্থানে মহামহিম আল্লাহ এ ঘোষণাও দিয়েছেন-

إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.

তাদের মৃত্যুর নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হয় তখন তারা তা এক মুহূর্তও বিলম্বিত করতে পারবে না, এমনকি মুহূর্তকাল ত্বরান্বিতও করতে পারবে না। -সূরা নাহল (১৬) : ৬১

নির্ধারিত সময়েই তাই সকলের মৃত্যু হবে। এখানে আমাদের কিছুই করার নেই। আমাদের করণীয় বরং পরবর্তী সময়ে-মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন জানাযা ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

মৃত ব্যক্তিকে সুন্দরভাবে গোসল করিয়ে কাফন পরানো এবং তার জানাযার নামায আদায় করে তাকে দাফন করা-এগুলো আপনজনদের করতে হয়। মাটি থেকেই মানুষের সৃষ্টি, দুনিয়ার জীবন শেষ করে মাটিতেই হয় তার শেষ গন্তব্য। কুরআনে কারীমের ভাষায়-

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى .

আমি তোমাদেরকে তা (অর্থাৎ মাটি) থেকেই সৃষ্টি করেছি, তাতেই আবার তোমাদের আমি ফিরিয়ে নেব এবং তা থেকেই পুনরায় তোমাদের জীবিত করব। -সূরা ত্বাহা (২০) : ৫৫

শরিয়তের নির্দেশনা অনুসারে গোসল-কাফন-জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করা তো আমাদের জানা বিষয়। তবে এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে-

দাফন যেন বিলম্বিত না হয়

নানা কারণেই মৃত ব্যক্তির দাফন বিলম্বিত করা হয়। কখনো দূর-দূরান্তের আপনজনদের অপেক্ষায়, কখনো অধিক মুসল্লির অংশগ্রহণে জানাযার নামায আদায় করার জন্যে, কখনো এক এলাকা থেকে মৃতদেহ অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে দাফন বিলম্বিত হয়। দুনিয়ার এ জীবন যার যত বেশি সামাজিক কর্ম, অবদান কিংবা অন্য কোনো দিক থেকে যে যত বেশি মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত, তার বিদায়ের সঙ্গে ঠিক তত বেশি মানুষেরই আবেগ জড়িয়ে থাকে। শেষবারের জন্যে একটু দেখার আকুলতা থাকে। এ সবই সত্য। কিন্তু শরীয়তের নির্দেশনা হল, কেউ যখন মারা যায়, তখন দ্রুতই যেন তাকে দাফন করা হয়। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস-

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُ سَوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. তোমরা মৃতব্যক্তির জানাযা-দাফন ইত্যাদি দ্রুত করো। সে যদি নেককার মানুষ হয়ে থাকে তবে তো তার জন্যে কল্যাণ ও পুরস্কার রয়েছে, তোমরা তাকে সেই কল্যাণের দিকেই এগিয়ে দিলে। আর যদি সে এমন না হয়, তবে (দাফনের মধ্য দিয়ে) তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে এ মন্দকে নামিয়ে দেবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩১৫

হাদীসের ভাষ্য তো পরিষ্কার-মৃত ব্যক্তি যেমনই হোক, নেককার হোক কিংবা না হোক, দ্রুত দাফনের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ, হয়তো তার জন্যে, কিংবা জীবিতদের জন্যে।

আরেকটি হাদীস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা.-কে বলেন-

يَا عَلِيُّ! ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ، وَالْأَيُّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْنًا. আলী! তিনটি জিনিস বিলম্বিত করো না-নামায, যখন এর সময় হয়ে যায়; জানাযার নামায এবং উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে মেয়েদের বিয়ে দেয়া। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১০৭৫

এজন্যে জানাযার নামায ও দাফন অপ্রয়োজনে বিলম্বিত করা উচিত নয়।

জানাযার নামায যদিও ফরযে কেফায়া, কিছু মানুষ পড়লেই সকলের পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়, কিন্তু জানাযার নামায মূলত একটি দুআ, মৃতব্যক্তির জন্যে জীবিতদের দুআ এবং তা এক মুসলমানের নিকট আরেক মুসলমানের হক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.

মুসলমানের ওপর মুসলমানের হক পাঁচটি-সালাম দিলে এর জবাব দেয়া, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, জানাযা ও দাফনে শরিক হওয়া, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা এবং হাঁচি দিয়ে কেউ আলহামদু লিল্লাহ বললে তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১২৪০

জানাযার নামাযের পর আসে দাফনের পর্ব। এ জীবনে যারা যত বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল, বিদায় বেলায় সাধারণত তারাই তত বেশি সঙ্গ দেয়। কাফন-জানাযা-দাফন সব পর্বেই তারা থাকে। জানাযার নামায শেষে অনেকেই চলে যায় যার যার মতো। আপনজনেরা থাকে, সঙ্গে আরও কেউ কেউ থাকে। জানাযার নামাযের সাথে সাথে দাফনকার্যে অংশগ্রহণকারীর জন্যে রয়েছে বড় পুরস্কারের ঘোষণা-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃতব্যক্তির জানাযার নামাযে যে শরীক হয় তার জন্যে রয়েছে এক কীরাত। আর যে তাকে দাফন করা পর্যন্ত থাকে, তার জন্যে রয়েছে দুই কীরাত। কেউ একজন প্রশ্ন করল-দুই কীরাত কী? তিনি তখন বললেন, দুটি বড় পাহাড়ের সমতুল্য। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩২৫

দাফনপরবর্তী সময়ে মৃতব্যক্তির অধিকার

দুআ ও ইস্তিগফার

জানাযার নামাযই মৃতব্যক্তির জন্যে একটি দুআ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই এক দুআই শেষ নয়। দাফনের পরপরই শুরু হয় তার কবরজগতের প্রশ্নোত্তর পর্ব। পরীক্ষার শুরু সেখানেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একজনকে দাফন করার পর সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন-

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ.

তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্যে ইস্তিগফার করো এবং তার জন্যে প্রার্থনা করো-সে যেন সত্যের ওপর অবিচল থাকতে পারে। এখন তো তাকে প্রশ্ন করা হবে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩২২৩

তাই দাফনের পরপর মৃতব্যক্তির জন্যে দুআ করা, তার সুওয়াল-জবাব যেন সহজ হয়, কবরের প্রতিটি ধাপই যেন সে সহজে পেরিয়ে যেতে পারে-এ দুআ জীবিতদের নিকট তার অধিকার।

আরেক হাদীসে দুআর নির্দেশনা এসেছে আরও ব্যাপক পরিসরে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

মানুষ যখন মারা যায় তখন তার সব আমলই বন্ধ হয়ে যায়। ব্যতিক্রম কেবল তিনটি-সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম আর এমন নেককার সন্তান, যে তার জন্যে দুআ করবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩১

মৃত্যুপরবর্তী সময়ের এ দুআ সন্তানের নিকট বাবা-মায়ের অধিকার। এ অধিকার এড়াতে পারবে না যারা সরাসরি সন্তান না হলেও ঘনিষ্ঠতায় এবং আন্তরিকতায় মৃতব্যক্তির সন্তানতুল্য।

ওসিয়ত ও দেনা পরিশোধ

মৃত ব্যক্তির যত দেনা, তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে সেসবও পরিশোধ করে দিতে হবে। যে ওসিয়ত তিনি করে যান, তাও আদায় করতে হবে, তবে তা পুরো সম্পদ দিয়ে নয়, বরং সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে। দেনার তালিকায় মানুষের আদায়যোগ্য ঋণ যেমন থাকতে পারে, থাকতে পারে শরীয়তের কোনো বিধানও। এক সাহাবী হজ্ব আদায় না করেই ইন্তেকাল করেন, অথচ তার ওপর হজ্ব ফরয হয়েছিল। তার ছেলে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার বাবা তো হজ্ব না করেই ইন্তেকাল করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন-

أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ ذَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَذَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ.

বলো তো, তোমার বাবার যদি কোনো ঋণ থাকত, তবে কি তুমি তা আদায় করতে? সাহাবী বললেন, হ্যাঁ, করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে আল্লাহ ঋণ আদায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। -সুনানে নাসাঈ, হাদীস ২৬৩৯

একই রকম প্রশ্ন করেছিলেন এক নারী সাহাবী। তার মা হজ্বের মান্নত করার পর তা আদায় না করেই মারা যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন-

حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ ذَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ أَفْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করো। তোমার মায়ের কোনো ঋণ থাকলে তুমি কি তা আদায় করতে না? আল্লাহ ঋণ আদায় করো। আল্লাহ প্রাপ্য আদায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৮৫২

হজ্ব ফরয হওয়ার পরও যদি আদায় না করেই কেউ মারা যায় তার উত্তরসূরীরা তা আদায়ের ব্যবস্থা করবে। তেমনি যদি কারও কাযা রোযা থেকে থাকে, নামায কাযা হয়ে থাকে, সেগুলোরও ফিদইয়া আদায় করবে। মান্নত থাকলে তা পুরা করবে।

ঈসালে সওয়াব

মৃত ব্যক্তির অধিকার আদায়ের জন্যে এ প্রক্রিয়াটি দীর্ঘস্থায়ী। ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে দান-সদকা যেমন করা যেতে পারে, এর পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত, নফল নামায, রোযা, কুরবানী, হজ্ব ইত্যাদি সবই করা যেতে পারে।

দুনিয়ার এ জীবনে কেউ চিরস্থায়ী নয়। আখেরাতই আসল গন্তব্য, স্থায়ী নিবাস। সেখানকার জীবন যেন সুন্দর হয়, সুখকর হয়, উপরোক্ত বিষয়গুলো এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। শুরুতেই বলে এসেছি-যার সঙ্গে সম্পর্ক যেমন, তার প্রতি অধিকারও তেমন। এ অধিকার আদায়ে যত্নবান হতে হবে আমাদের।

© মাসিক আল কাউসার

পক্ষান্তরে হিন্দু ধর্মে আমরা দেখতে পাই মৃত ব্যক্তিকে আগুনে পোড়ানোর জন্য চিতায় উঠানো হয় তখন প্রয়োজনে মৃত দেহকে বিভিন্নভাবে ভাজ করে দেওয়া হয়, প্রয়োজনে ডাল-পালার মতো হাত-পা ভেঙে পুড়ানো হয়, যা মৃত দেহকে অসম্মান ও কষ্ট দেওয়ার শামিল। অথচ ইসলাম ধর্মে মৃত দেহকে অতি যত্ন সহকারে দাফন করা হয়।

উপসংহার:

ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। আর আত্মসমর্পণেই রয়েছে শান্তি। তাই ইসলাম কে বলা হয় শান্তির ধর্ম। ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য্যতা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। কেননা ইসলাম আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে মনোনীত শ্রেষ্ঠতম ধর্ম। আর এ ধর্মের বিধান কোন মানবরচিত নয়। স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লাই পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে মানুষকে জীবন পরিচালিত করার বিধানসমূহ জানিয়ে দিয়েছেন। এতে এমন কোন কিছুই বাদ রাখা হয়নি যেটা মানুষের প্রয়োজন। আর সৃষ্টিকর্তার রচিত বিধানের চেয়ে অন্যান্য কোন বিধান শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। আর যে ইসলাম অনুসরণ করবে সে দুনিয়া ও পরকালে উভয় জগতেই লাভবান হবেন।
“ইসলাম শান্তির ধর্ম” : কেন ও কীভাবে

‘ইসলাম শান্তির ধর্ম’ কথাটি মুসলিম মাত্রেই মনের কথা এবং অতি সত্য ও বাস্তব কথা। তবে বহুল উচ্চারিত অনেক সত্য কথার মতো এ কথারও মর্ম ও বিস্তৃতি সঠিকভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কারণ, সঠিক কথারও ভুল বা অসম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে। কুরআন মাজীদে আলকুরআনের তথা ইসলামের শিক্ষা ও বিধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

...তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চায় এ দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন নিজ ইচ্ছায়। আর তাদের পথ দেখান সরল পথ। -

সূরা মাইদা (৫) : ১৫-১৬

এ আয়াতে ‘সালাম’ শব্দ আছে। সাধারণত ‘সালাম’ শব্দের অর্থ করা হয় ‘শান্তি’। এ অর্থ ভুল নয়, তবে সূক্ষ্ম অর্থ হচ্ছে ‘মুক্তি’। বিপদ ও অশান্তি থেকে মুক্তিই তো শান্তির বড় উপায়। ইসলাম মানুষকে বিপদ ও অশান্তি থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। তাই ইসলাম শান্তির ধর্ম।

ইসলামের কিতাব আলকুরআন মানুষকে নাজাতের পথ দেখায়। কী থেকে নাজাতের? প্রথমত আখিরাতে মহা বিপদ থেকে নাজাতের। ইসলামী আকীদার এক প্রধান বিষয় আখিরাতে ঈমান এবং ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার গোটা ব্যবস্থাটিই তাকওয়া (খোদাভীতি) ও ঈমান বিল আখিরাহ (আখিরাতে উপর ঈমান)-এর উপর ভিত্তিশীল। তেমনি ইসলামী দাওয়াতের প্রধান অংশ আখিরাতে ও আখিরাতে নাজাত। ইসলামের নবী, বিশ্ব মানবতার নবী হযরত মুহাম্মাদুর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল আখিরাত এবং তাঁর গোটা জীবনের সফল সমুজ্জ্বল বিস্তৃত ও বিচিত্র দাওয়াতী কর্মতৎপরতার অন্তর্নিহিত ঐক্যের সূত্রটি ছিল আখিরাত। ইসলামের আকীদা-প্রসঙ্গ হোক বা ইবাদত, লেনদেন হোক বা সামাজিকতা, স্বভাব-চরিত্র হোক বা আচার-আচরণ, সৎকাজের আদেশ হোক বা অসৎকাজের নিষেধ এককথায় মানবজীবনের সব বিষয়ে ইসলামের যে বিশ্বাস ও বিধান তা গ্রহণ ও অনুসরণের মূল প্রেরণা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের নাজাত। এ কারণে ইসলামের করণীয়-বর্জনীয় সকল বিষয়ের সাথে যে পরিভাষাগুলো জড়িত তা হচ্ছে ছওয়াব ও গুনাহ, জান্নাত ও জাহান্নাম, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি। ইসলামের কোন শিক্ষাটি এমন যেখানে পাপ-পুণ্যের, জান্নাত-জাহান্নামের এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির প্রসঙ্গ নেই?

ইসলামী দাওয়াতের শিরোনাম-বাক্য যদি হয় ‘আল্লিম তালাম’ ‘ইসলাম কবুল কর নাজাত পাবে।’ তাহলে এই নাজাত প্রধানত আখিরাতের নাজাত। ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের অন্যতম উদ্দেশ্য যদি হয়- ‘ইন্নী নায়ীরুল লাকুম বাইনা ইয়াদাই আযাবিন শাদীদ’ (আমি এক কঠিন আযাবের পূর্বে তোমাদের হুঁশিয়ারকারী।) তাহলে এই আযাব প্রধানত আখিরাতের আযাব। সুতরাং ‘ইসলাম শান্তির ধর্ম’- কথাটির প্রধান মর্মবাণী আখিরাতের নাজাত ও শান্তি। অর্থাৎ ইসলাম ঐ ধর্ম যা আখিরাতের নাজাত ও শান্তির পথ প্রদর্শন করে। বরং একমাত্র ইসলামই ঐ ধর্ম যার মাধ্যমে আখিরাতে নাজাত পাওয়া যাবে।

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন কবুল করতে চাইলে তার নিকট থেকে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। -সূরা আলে ইমরান

(৩) : ৮৫

এই মর্ম বিস্মৃত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

এ অর্থ অনুসারে ‘ইসলাম শান্তির ধর্ম’ কথাটিতে বিশ্বাসের দাবি, আখিরাতে নাজাতের যে পথ ইসলাম দেখায় সেই পথের পথিক হওয়া। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আপন আকীদা-বিশ্বাস দুরস্ত করা, আল্লাহর হক ও বান্দার হক সম্পর্কে জানা ও তা আদায় করা, সব রকমের গোনাহ ও পাপাচার থেকে এবং আল্লাহর হক ও বান্দার হক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা। মৃত্যু পর্যন্ত ইসলাম-নির্দেশিত পথে থেকে আখিরাতের চিরস্থায়ী শান্তির উপযুক্ত হওয়া।

শুরুতে সূরা মাইদার যে আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে তাতে ‘সুবুলাস সালাম’ (মুক্তির পথসমূহ) শব্দবন্ধে পার্থিব মুক্তিও শামিল। এক্ষেত্রেও ইসলাম ঐ অদ্বিতীয় ধর্ম যাতে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রের এবং মানবজাতির সকল শ্রেণির যথার্থ শান্তি ও কল্যাণের পথনির্দেশ রয়েছে। এটা বোঝার জন্য ইসলামের এক একটি শিক্ষা ও বিধানের যথার্থতা নিয়ে নির্মোহ চিন্তা-

ভাবনাই যথেষ্ট। তাহলে দেখা যাবে ইসলামের শিক্ষা ও বিধানের অনুসরণেই রয়েছে মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা ও প্রশান্তির নিশ্চয়তা।

কে না জানে শান্তি ও প্রশান্তির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানুষের মন। মনে যদি শান্তি থাকে তাহলে গোটা সভায় শান্তি বিরাজ করে। আর মন যদি অশান্ত হয় মানবের গোটা সভা অশান্তিতে আক্রান্ত হয়। মনের শান্তির একমাত্র উপায় আল্লাহর স্মরণ, তাঁর প্রতি আস্থা ও সমর্পণ এবং জীবন ও জগতের সকল বিষয়ে তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্টি। এই সম্পদ যে পেয়েছে জীবনে তার দুঃখ-কষ্ট থাকতে পারে, উপায়-উপকরণের স্বল্পতাও থাকতে পারে কিন্তু অশান্তি থাকে না। কারণ মহান আল্লাহ তার হৃদয়কে পরিতুষ্টি ও পরিতৃপ্তি দ্বারা পূর্ণ করে দেন। আল্লাহর প্রতি আস্থার অবলম্বনে তাঁর হৃদয় থাকে ভারমুক্ত ও শঙ্কামুক্ত। পক্ষান্তরে এই সম্পদ যে পায়নি ভোগের সকল উপকরণের মাঝেও সে শান্তি খুঁজে পায় না। অশান্তির আগুনে দগ্ধ হতে থাকে। কারণ তুষ্টি ও আনন্দ, আস্থার অবলম্বন ও ভারমুক্ততা এবং বিবেকের দংশন থেকে মুক্তির মতো শান্তির উপকরণগুলো থেকে তার হৃদয়-মন বঞ্চিত থাকে। মনের এই ক্ষোভ, অতৃপ্তি ও হাহাকারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার কর্ম ও আচরণে। তার শিক্ষাহীন হৃদয়ের ঔদ্ধত্য, হিংস্রতা, কুটিলতা ও কপটতা একে একে বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকে এবং শুধু তাকেই নয়, তার আপনজন, প্রিয়জন, পাড়া-প্রতিবেশি, কর্তা-সহকর্মী অধীনস্ত সবাইকে সম্বলিত ও বিপদগ্রস্ত করে তোলে। ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সত্য বলেছেন- ‘মানব-দেহে একটি মাংসপি- রয়েছে। যখন তা শুদ্ধ হয় গোটা দেহ শুদ্ধ হয় আর যখন তা নষ্ট হয় গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায়। শোনো, তা হচ্ছে কলব (হৃদয়)।

সামষ্টিক জীবনের শান্তি নির্ভর করে পারস্পরিক অধিকার রক্ষা এবং একের অস্তিত্ব অন্যের জন্য অশান্তির কারণ না হওয়ার উপর। তাই ব্যক্তির পরিশুদ্ধি তথা মানবীয় সুকুমারবৃত্তির বিকাশ, উন্নত গুণাবলির উৎকর্ষ, মন্দ প্রবণতাসমূহের নিয়ন্ত্রণ, পরস্পরের হক ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং উত্তম পরিশীলিত আচরণ-উচ্চারণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। আখলাক ও তাযকিয়া ইসলামী শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আখলাক তথা স্বভাব-চরিত্রের পরিশুদ্ধির সাথে ইসলামে অতি বিস্তৃতভাবে রয়েছে সামষ্টিক জীবনে পারস্পরিক কর্তব্য ও অধিকারের বর্ণনা ও শিক্ষা। তাই ‘আখলাক’ ও ‘মুআশারা’ ইসলামী শিক্ষা ও জীবন-ব্যবস্থার দুই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বর্তমান বিশ্বসভ্যতার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যতটা অপরিহার্য পার্থিব জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ইসলামের ‘আখলাক’ ও ‘মুআশারা’র শিক্ষা তার চেয়েও বেশি অপরিহার্য। এই শিক্ষার চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই সূচিত হতে পারে সামষ্টিক জীবনের শান্তি ও স্বস্তি।

সুতরাং ‘ইসলাম শান্তির ধর্ম’- এই বিশ্বাস ও উচ্চারণের দাবি, আল্লাহমুখিতা, আল্লাহর প্রতি আস্থা ও সমর্পণ, খোদাভীতি ও আখিরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতির মতো বৈশিষ্ট্যগুলোর পাশাপাশি ইসলামী আখলাক ও মুআশারা তথা ইসলামী স্বভাব-চরিত্র ও সামষ্টিক জীবনের ইসলামী নীতি ও বিধানের চর্চা ও অনুশীলন।

এরপর শান্তির জন্য শুধু শিষ্টের ও শিষ্টতার লালনই যথেষ্ট নয়, দুষ্টের ও দুষ্টপ্রবণতার দমনও অপরিহার্য। তাই শান্তির ধর্ম ইসলামে রয়েছে হৃদ-কিসাস-তায়ীরের মতো নানা বিধান। রয়েছে নাহি আনিল মুনকার ও জিহাদের বিধান। এগুলো ইসলামের স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত অধ্যায়। রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীলদের দায়িত্ব এসব বিধানের জ্ঞান যথাযথভাবে অর্জন করে সেগুলো বাস্তবায়ন করা। এই অধ্যায়ের নীতি ও বিধানের সঠিক উপলব্ধি ও যথার্থ প্রয়োগ সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা এবং ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। এমনিভাবে নাগরিকদের ফৌজদারী অপরাধের বিচারের পাশাপাশি এটাও নিশ্চিত হওয়া দরকার যে, ক্ষমতাবানগণ কর্তৃক যেন এমন কোনো অপরাধ সংঘটিত না হয়। হত্যা, গুপ্তহত্যা, গুম, খুনের মত অপরাধগুলো যেন কারো থেকেই সংঘটিত না হয়। সুতরাং ‘ইসলাম শান্তির ধর্ম’- এই বিশ্বাস ও উচ্চারণের এক দাবি, ইসলামের নাহি আনিল মুনকারের নীতি ও বিধানের যথার্থতা উপলব্ধি এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান অনুসারে এর চর্চা ও অনুশীলন।

এক কথায় ইসলাম বাস্তব অর্থে শান্তির ধর্ম। যে কেউ কোনো কিছুকে শান্তি মনে করে; ইসলামকে ঐ অর্থে শান্তির ধর্ম মনে করা ভুল। অন্যায় অনাচার, অশ্লীলতা, জুলুম-অবিচার হিংস্রতা ইত্যাদিকে কেউ যদি ‘শান্তি’ মনে করে তাহলে ইসলাম ঐ অর্থে শান্তির ধর্ম নয়। কারণ এগুলো ‘শান্তি’ নয়, নির্বিচার ইচ্ছা পূরণ মাত্র, যা দুনিয়া আখেরাতের চূড়ান্ত অশান্তির কারণ।

মুমিনের প্রতি কুরআন মাজীদের ইরশাদ-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বাঙ্গিকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। -সূরা বাকারা (২) : ২০৮

সুতরাং মুমিনের কর্তব্য, পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ করা এবং জীবনের সকল অঙ্গনে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও বিধানের চর্চা ও বিস্তারে ব্রতী হওয়া। তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের জীবনে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করবে এবং ইসলাম শান্তির ধর্ম কথাটির সত্যতা ও যথার্থতা বাস্তবরূপে প্রতিফলিত হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ইসলামের পূর্ণ অনুসারী করুন ইসলামের সৌন্দর্য্যতায় আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের শুশীতল ছায়াতলে আসার তৌফিক দান করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের পূর্ণ শান্তি দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

" নির্ধারিত মূল শিরোনাম টি ' দ্বীনে ইসলামের বৈশিষ্ট্য' এই কিতাবের সাথে মিল থাকায় বিভিন্ন স্থানে এই কিতাব থেকে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মাসিক আল কাউসার থেকে এবং উইকিপিডিয়া থেকেও নেওয়া হয়েছে। "

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى ، اللَّهُمَّ أَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا وَ عَمَلًا وَتَقَبَّلْ مِنَّا)
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللَّهُمَّ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

""সমাপ্ত হলো আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসার সাথে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা থেকে আমাদের উপকৃত করুন, আমাদেরকে এমন কিছু শিখান যা আমাদের জন্য উপকারী এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল বৃদ্ধি দিন।

আর আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করে নিন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। কবুল করে নিন হে আল্লাহ! সমস্ত জগতের পালনকর্তা!")"